গত ১০টি সংখ্যা একসাথে নিলেই পাচ্ছো

১৫% ছাড়ে

~~৩১০~~

২৭০

টাকায়

নিম্নের মার্কেটিং এর নাম্বারে যোগাযোগ করে নির্দিষ্ট টাকা পরিশোধ করে বুঝে নাও তোমার কাঙ্ক্ষিত ব্যাপন সংখ্যা

যোগাযোগঃ **ব্যাপন**
৪৮/১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ০১৭২৫-২৬৪০১০ (মার্কেটিং)
০১৭০৪-৯৬০৩১৪ (অফিস)
০১৭৩৩-৪২৬০৩৬ (পাঠক মেলা)
ইমেইল: byapon@gmail.com
ফেসবুক: www.facebook.com/ByaponSM
ওয়েব: www.byapon.com

জুলাই-আগস্ট'২১
বর্ষ ৬ | সংখ্যা ৬

ব্যাপন

কিশোর বিজ্ঞান সাময়িকী

বায়োলুমিনেসেন্সের জগতে

ডাইনোসরদের নিয়ে কিছু ভ্রান্ত ধারণা

জিনেতে কারসাজি

মহাজাগতিক বার্তা

মেরুর বাতি মেরুজ্যোতি

জেলাভিত্তিক পত্রিকা এজেন্টদের তালিকা

জেলা	এজেন্টের নাম	মোবাইল	জেলা	এজেন্টের নাম	মোবাইল
মোমেনশাহী	সনজীব হাওলাদার	০১৭৩১১১১০৯০	টাঙ্গাইল	আব্দুল মান্নান	০১৫৫২৩৫৯০২৭
পাবনা	সুমন কুমার কুণ্ডু	০১৭৬২৬০২৬৪২	কুমিল্লা	এস.আর ভূঁইয়া	০১৭১১১৬৮০২১
পাবনা	জাহান বুক	০১৭১৭৩৩০০২৪	নাটোর	খন্দকার জালাল উদ্দিন	০১৭১৩৭০৭৪১১
রাজশাহী	চন্দন কুমার	০১৫৫৮৮৬০৭৭০	গাইবান্দা	শেখ আব্দুর রাহমান	০১৭১২৬৩৩৮৯৯
দিনাজপুর	মো: রুবেল সরকার	০১৯১৮৫১০২৭৬	জয়পুরহাট	আব্দুল হামিদ বাবু	০১৭১২৫৬৭৩৮০
কক্সবাজার	জয়নাল আবেদীন	০১৭১৩৬১৯৮২৭	লালমনিরহাট	সাজেদ আলম	০১৭১১০৬৬৫৬১
চাপাইনবাবগঞ্জ	বাকীমুদ্দিন	০১৭১২৫৩৮৮৩৮	রাজবাড়ী	মনোয়ার হোসেন	০১৭২০৫২২৩১২
সিলেট	উদায়ন নিউজ এজেন্সি	০১৭১১২৬৩০২৬	গোপালগঞ্জ	দোয়ামই শরমা	০১৭১১৪৪৩৩৭৪
কিশোরগঞ্জ	তোফাজ্জল হোসেন	০১৯১১২১৮৭৭৯	রাজবাড়ী	মনিরুজ্জামান	০১৭১৮৩০৩১৫৭
হবিগঞ্জ	বারী লসকর	০১৭১১১৭৬২৭৮	চট্টগ্রাম	হারুন-অর-রশীদ	০১৭১১৪৬৩৪৩৩
যশোর	খোরশেদ আনোয়ার	০১৭১৫০৬৭০১৬	ঠাকুরগাঁও	সংবাদ বিতরনী	০১৭২৩৫৬২৯৬৬
খুলনা	পাটোয়ারী নিউজ এজেন্সি	০১৯১৩০১৬৫৩১	চট্টগ্রাম	লোকমান হাকীম	০১৮২৩৩১২০১৮
কুষ্টিয়া	ইউসুফ আলী	০১৮২২৮৬২২৯৭	গাইবান্দা	জাহাঙ্গির আলম	০১৭১৬২৭৫৮৬৮
বরিশাল	রকি নিউজ এজেন্সি	০১৭১১৩৬৩১৯৪	গাজিপুর (গাজিপুরা)	ইমরান হোসেন	০১৬৭২৮৮৬৫১০
সিরাজগঞ্জ	আমির আলী	০১৭১৩৭০৫২৮৮	গাজীপুর (শ্রীপুর)	নূর লাইব্রেরী	০১৯৩৯৭৪২১৪২
কক্সবাজার (চকোরিয়া)	কামাল উদ্দিন	০১৮১৯৮৩৭৯৪২	পাবনা	বিসমিল্লাহ কনফেকশনারী	০১৭৪৩৮৮২৩৪৯
ঝিনাইদহ	ফারুক লাইব্রেরী	০১৯৭৭৫২৫৩৫৩	ফরিদপুর (হাইস্কুল মার্কেট)	সাইদুল লাইব্রেরী	০১৭৪৪৩৪৭৬১১
দিনাজপুর	বৈশাখী লাইব্রেরী	০১৭৩৬২৬৮৪৮৫	মানিকগঞ্জ	নগেনবাবু	০১৯২১৬৭৯১৩৯
গাজীপুর	আল ইত্তেহাদ ফাউন্ডেশন	০১৯৭৭৪৪২৩২৩	কুষ্টিয়া (ভাটাই থানা)	শাহিন এন্টারপ্রাইজ	০১৭১০৭৪৫৫১৩

লেখা আহ্বান

বন্ধুরা, তোমরাও যখন খুশি, যত খুশি লেখা পাঠাতে পারো তোমাদেরই প্রিয় ব্যাপন পত্রিকায়। লেখা পাঠানোর ক্ষেত্রে নিচের নিয়মগুলো অবশ্যই মেনে চলবে:

১। লেখা বাংলায় লিখতে হবে। ইংরেজি বা অন্য কোনো ভাষায় লেখা গ্রহণযোগ্য হবে না।

২। ইমেইলে লেখা পাঠানোর ক্ষেত্রে মেইলের সাবজেক্টে অবশ্যই বিভাগের ও লেখার নাম দিতে হবে এবং প্রতিটি লেখা অবশ্যই স্বতন্ত্র ফাইল হিসেবে মেইলের সাথে সংযুক্ত করে দিতে হবে।

৩। প্রতিটি লেখা নিজ থেকে লিখতে হবে। অন্যস্থানে প্রকাশিত লেখা কপি করে পাঠানো যাবে না। তবে সূত্র উল্লেখ করে অনুবাদ করে পাঠানো যাবে।

৪। প্রতিটি লেখার সঙ্গে অবশ্যই নিজের নাম, পূর্ণ ঠিকানা, যোগাযোগের নম্বর, শ্রেণি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম লিখে পাঠাতে হবে।

লেখা পাঠাতে পারো যেভাবে

১। ব্যাপন অফিসের ঠিকানায় : ব্যাপন ৪৮/১ (৫ম তলা), মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
২। ইমেইল এর মাধ্যমে : byapon@gmail.com

রাজধানী ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে তোমার নিকটবর্তী যেসব বিক্রয় কেন্দ্রে
‘ব্যাপন কিশোর বিজ্ঞান সাময়িকী’ পাওয়া যাচ্ছে।

ঢাকা
আমির এন্ড সনস, পুরানা পল্টন, ০১৭১১১৩৭৮৫১
নিউ গুড ওয়ার্ড লাইব্রেরি, খিলগাঁও চৌরাস্তা, ০১৭২৬৮২৩৮২
কনফিডেন্ট লাইব্রেরী, আরামবাগ, মতিঝিল, ০১৮১৮৮১৫৩১৭
কাঞ্চন লাইব্রেরী, মুগদা বড় মসজিদের সামনে, মুগদা
প্রথম আলো সংবাদ বিক্রয়কেন্দ্র, তালতলা, খিলগাঁও

উত্তরা
বুক ফেয়ার, রাজউক কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, ০১৭৩ ০১৭৭৮০৭
উত্তরা বইঘর, রাজউক কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স
মনোলোভা, কুর্মিটোলা স্কুল
মেসার্স আপন এন্টারপ্রাইজ বুকস এন্ড স্টেশনারী, ০১৭১২৫৪৬৪০৪

ফার্মগেট
কোবির ক্যাপিটাল স্টেশনারি, তেজতুরী বাজার ফার্মগেট, ০১৯১৩৫১২৪৪৮
গ্রীন লাইব্রেরি, গ্রীন রোড,

মিরপুর
মোঃ শাহিন, মিরপুর ১৩, ০১৯২২৬৯৩৫৭৭
গ্রামীণ লাইব্রেরি, মিরপুর ১৪, ০১৭২৫৫৮২৪৫২
প্রিন্স পেপার, মিরপুর-২, ০১৭১৫৪৬০৯৩৫
জিহাদ গ্রামীণ লাইব্রেরি, মিরপুর ১৪, ০১৬৭৬২৩৬৫২৩
গ্রামীণ লাইব্রেরি, মিরপুর ১০, ০১৬৭৬২৩৬৫২৩
মানিকদী বুক সেন্টার, রুপনগর, ০১৭১৩৭১৬৮৭৭

সাভার
হাফসা লাইব্রেরী, সাভার

ময়মনসিংহ
গাঙ্গিনার পাড় (শাপলা চত্তরের পাশে) পত্রিকা বিক্রয় কেন্দ্র, ০১৭৯৬১৭০২৫৫
গাঙ্গিনারপাড় মোড়, পত্রিকা বিক্রয় কেন্দ্র, ০১৭০৩৫০৫১৪৬

সংকলন লাইব্রেরি, সদর
রহমানিয়া লাইব্রেরী, নান্দাইল, ময়মনসিংহ, ০১৭১০৫১৮২২৩,
মক্কা ষ্টোর, থানা রোড, বাসট্যান্ড, ফুলপুর, ময়মনসিংহ, ০১৭৭২৪২৪৯৫৮
আল-আমিন লাইব্রেরী, কাশিগঞ্জ, তারাকান্দা, ময়মনসিংহ, ০১৭৪৩৬৭৬৪৮০

রাজশাহী
নিউজ হোম, ৭ নং গোল্ডেন প্লাজা, সোনাদিঘীর মোড়, রাজশাহী, ০১৫৫৮৪২৭৯২৫
বরেন্দ্র বইঘর, ৮ নং গোল্ডেন প্লাজা, সোনাদীঘির মোড়, ০১৫৫৬৩০৯৫৫৬
আলীগড় লাইব্রেরি, মনিচত্তর, রাজশাহী, ০১৭১১৩০২৯৩০
রেলওয়ে বুক, রেলস্টেশন, রাজশাহী, ০১৭১১৫৬৫৬৭০
আল হুদা ইসলামী লাইব্রেরী, আমচত্তর, নওদাপাড়া, রাজশাহী, ০১৭২০৬৬৭৯৩০

খুলনা
রংধনু ফটোস্ট্যাট এন্ড স্টেশনারী, মৌ মার্কেট, বয়রা বাজার, সোনাডাঙ্গা, খুলনা, ০১৯১৬০৫৪৭০৫
জান্নাতুল মাওয়া ভ্যারাইটিজ স্টোর, ডে নাইট কলেজ রোড, গ্রীনল্যান্ড মসজিদ এর সামনে, পাবলা, দৌলতপুর, খুলনা
মাহিম আইটি ভিলেজ, ডে নাইট কলেজ রোড, পাবলা দৌলতপুর, খুলনা, ০১৯১৪৮৫৩৯৩৩

বরিশাল
হক লাইব্রেরী-১, বি এম কলেজ রোড, মসজিদ গেইটের পশ্চিম পার্শ্বে ২য় স্টল, ০১৭২৪৮৫১৬৫৮, ০১৯২৪৩৭৮৫৭০
ইসলামিয়া লাইব্রেরী, প্যারারা রোড সদর, বরিশাল, ০১৭৩১৯৮৭৯৭৩, ০১৭১৪৩৫১৯৮৫
নিউ মাহবুব লাইব্রেরী, সদর রোড বরিশাল, ০১৭৩৩১০৭৭২০

চট্টগ্রাম
আলাউদ্দীন ষ্টোর,কলিজিয়েট স্কুল গেইট, চট্রগ্রাম
অলি লাইব্রেরী, নেভী হসপিটাল গেইট, চট্রগ্রাম
আড়িয়াল লাইব্রেরী, ০১৭৯০৪৫৯৯৩৪

সিলেট সদর
বই বিলাস
বন্ধু লাইব্রেরী
নীলক্ষেত লাইব্রেরী
অপি লাইব্রেরী
বর্ণমালা লাইব্রেরী
এডু পয়েন্ট, আখালিয়া, সিলেট, ০১৭৫৯৩২৯২১৯
জননী এন্টারপ্রাইজ, বিশ্ববিদ্যালয় গেইট, শাবিপ্রবি, ০১৭৪৮২৩৬৭৬৪
এল. আর এন্টারপ্রাইজ, বিশ্ববিদ্যালয় গেইট, ০১৭২০৯২৪৪৪৮

মুন্সিগঞ্জ
পত্রিকা বিতান, মুন্সিগঞ্জ শহর জামে মসজিদ সংলগ্ন, ০১৯১১৫৫৫৮৯০

চাঁপাইনবাবগঞ্জ
ছাত্রবন্ধু পুস্তকালয়, নিউ মার্কেট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
আদর্শ বই বিতান, পুরাতন বাজার, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
আইকন আইটি সেন্টার, শান্তিমোড় চাঁপাই নবাবগঞ্জ

মৌলভীবাজার
বই ঘর: প্রেসক্লাব মোড়, শাহ্ মোস্তফা রোড (হাফিজা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের পার্শ্বে) মৌলভীবাজার
সিটি লাইব্রেরি এন্ড স্টেশনারি, পুরাতন হাসপাতাল রোড, (সরকারি স্কুলের পার্শ্বে), ০১৭১৯১৮৯৭৮০
কলেজ লাইব্রেরি এন্ড স্টেশনারি, কোর্ট রোড

লক্ষীপুর
টাউন লাইব্রেরি, লক্ষীপুর শহর
ছাত্রবন্ধু লাইব্রেরি, লক্ষীপুর শহর
আল বারাকা লাইব্রেরি, লক্ষীপুর শহর
ইকরা বুকস এন্ড ষ্টেশনারী, কলেজ রোড, লক্ষীপুর শহর

ফেনী
ইসলামী বইঘর, ফেনী শহর
ইকরা লাইব্রেরী চাহিদা, ফেনী শহর
আজিজিয়া লাইব্রেরী চাহিদা, ফেনী শহর

কুষ্টিয়া
শাহিন এন্টারপ্রাইজ, কাটায়খানা মোড়, ০১৭১০৭৪৫৫১৩
সাথি পেপারস এন্ডবুক হাউজ, ইসলামিয়া কলেজ গলি, ০১৮১৮৩৫০৯৫৯
বই সমাবেশ, কোর্ট স্টেশন রোড, ০১৭৩৪৩৩৭৬১

নেত্রকোনা
আদর্শ লাইব্রেরি, নেত্রকোনা শহর
আহসান লাইব্রেরি, নেত্রকোনা শহর
মুকুট মনি লাইব্রেরি, নেত্রকোনা শহর

সম্পাদক
ড. মো: শামসুল আরিফিন জিলানী

সহকারি সম্পাদক
মেহেদী হাসান

সম্পাদনা সহযোগী
আব্দুল্যাহ আদিল মাহমুদ
আদনান মুস্তারী
মো: মোখলেছুর রহমান
মুজতাহিদ আকোন
মোকারম হোসেন

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আশরাফুল ইসলাম

ডিজাইন ও ইলাস্ট্রেশন
মোহাম্মাদ স্বপন

প্রকাশক
ড. মো: মোশাররফ হোসেন

মূল্য ৩০ টাকা

যোগাযোগঃ **ব্যাপন**
৪৮/১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ০১৭২৫-২৬৪০১০ (মার্কেটিং)
০১৭০৪-৯৬০৩১৪ (অফিস)
০১৭৩৩-৪২৬০৩৬ (পাঠক মেলা)
ইমেইল: byapon@gmail.com
ফেসবুক: www.facebook.com/ByaponSM
ওয়েব: www.byapon.com

ব্যাপন
কিশোর বিজ্ঞান সাময়িকী

সূচিপত্র

মেরুর বাতি মেরুজ্যোতি
আবরার জাওয়াদ ০৪

জিনেতে কারসাজি
শময়িতাসাইদ ১০

Touring The Cosmos
মায়িশা ফারজানা ১৭

বাংলা ফন্ট:
জন্ম থেকে বর্তমান
মুহাম্মাদ ২১

মহাজাগতিক বার্তা
মোঃ মুফরাদ আলী ৩১

কী হতো যদি অসংখ্য
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃষ্টিফোঁটার বদলে
আস্ত মেঘটিই একটি ফোঁটা
হয়ে ভূপৃষ্ঠে আছড়ে পড়ত?
মোঃ ইমন খন্দকার ৩৭

ডাইনোসরদের নিয়ে
কিছু ভ্রান্ত ধারণা
জয় দেব নাথ ৫৬

ঔষধ পরিচিতি ৫৩
স্বাস্থ্যকথা ৬৩
প্রশ্নোত্তর ৬৫
অভিমত ৬৭

৪২

প্রচ্ছদ রচনা

বায়োলুমিনেসেন্সের জগতে

অনির্বান মৈত্র আবির

সম্পাদকীয়

সুপ্রিয় ব্যাপন বন্ধুরা,

এক অনিশ্চিত ও স্থবির সময়ের মধ্য দিয়ে পার করতে হচ্ছে আমাদের প্রতিটা দিন, তবুও আন্তরিকভাবে আশা করছি তোমরা সুস্থ ও ভালো আছো। ভারতীয় ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট নিয়ে যে আশঙ্কা করা হচ্ছিলো, দুঃস্বপ্নের মত তাই যেন বাস্তবতায় পরিণত হতে চলেছে। ইতোমধ্যে দেশে ছড়িয়ে পড়েছে প্রাণঘাতী এই ভাইরাসের প্রকোপ। এই প্রকোপ নিয়ন্ত্রণে আনতে দেশজুড়ে আরোপিত হয়েছে কঠোর লকডাউন। দৈনিক মৃত্যুর কোটা পার হয়েছে একশোর ঘর। ভ্যাক্সিন কার্যক্রমও চলছে খুব ধীরগতিতে। পর্যাপ্ত ভ্যাক্সিন পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা কাটছেই না। কবে এই দমবন্ধ পরিস্থিতির অবসান ঘটবে একমাত্র সৃষ্টিকর্তাই জানেন। তবুও আমরা আশা রাখতে চাই, দ্রুতই এই সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে আসবে এবং সবকিছু স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ফিরবে; আর স্কুল-কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আবারো প্রাণ ফিরে পাবে।

প্রিয় পাঠক বন্ধুরা,

চলমান পরিস্থিতিতে বড় আশঙ্কা হয়ে দেখা দিচ্ছে অবসরের দীর্ঘসূত্রিতা। প্রায় দেড় বছরের কাছাকাছি সময় আমরা ঘরে বসে আছি। অবসর সময় কাটাচ্ছি। অনেকেই এই অবসরে বই থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছো। অনেকে মোবাইল, ল্যাপটপ, টেলিভিশনের মাধ্যমে সময় অতিবাহিত করছো। একাডেমিক পড়াশুনার জন্য যেমন মোবাইল বা ল্যাপটপে অনলাইনে ক্লাস পরীক্ষা দিতে হচ্ছে, ঠিক তার উল্টো পিঠে ভয়ানক বিপদেরও আশঙ্কা রয়েছে। মোবাইল ও ল্যাপটপের স্ক্রিন থেকে চোখে আসে নানা ধরণের ক্ষতিকর রশ্মি, যেগুলোর প্রভাব পড়ে আমাদের মস্তিষ্কের উপর। এর ক্ষতিকর প্রভাব চিন্তাশক্তি কমিয়ে দিয়ে আমাদের মেধাকে করে দিতে পারে অকেজো। এদিকগুলোও আমাদের নজরে রাখতে হবে। অনেকেই গেমসে মারাত্মকভাবে আসক্ত হয়ে পড়ছো। এই ছোট বয়সেই এইসব ক্ষতিকর আসক্তিতে জড়িয়ে পড়লে ভবিষ্যতে চুকাতে হতে পারে বড় মূল্য। তাই সতর্ক হতে হবে সঠিক সময়েই।

প্রিয় বন্ধুরা,

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষাগুলো এবারও হয়তো হচ্ছে না। গতবারের ন্যায় অন্য কোনো বিকল্প পদ্ধতিতে হয়তো মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হবে শিক্ষার্থীদের। তোমরা যারা পরীক্ষার্থী আছো তারা কতটা মানসিক চাপ ও অস্থিরতার মধ্য দিয়ে দিন অতিবাহিত করছো তা কিছুটা হলেও আমরা বুঝতে পারি। তবুও সাহস জোগাতে চাই, এই পরিস্থিতির অবসান একদিন ঘটবেই ইনশাআল্লাহ্।

সবশেষে, একটা অনুরোধ করতে চাই। কষ্ট করে হলেও নিজেদেরকে পড়াশুনার মধ্যে রাখো। এখন যদি তোমাদের পড়াশুনায় ঘাটতি রয়ে যায়, পরবর্তীতে তা কুলিয়ে উঠতে কিন্তু অনেক বেশি বেগ পেতে হবে। এজন্য যতটা সম্ভব বইকে কাছে রাখো। এই অনুরোধ রেখে ষষ্ঠ বর্ষের শেষ সংখ্যাটি তোমাদের হাতে তুলে দিলাম।

করোনার ব্যাপারে সচেতন থেকো। মহান সৃষ্টিকর্তা সবাইকে নিরাপদ রাখুন।

মেরুর বাতি মেরুজ্যোতি

আবরার জাওয়াদ

এক অদ্ভুত সৌন্দর্যের নাম হলো মেরুজ্যোতি। দেখলে মনে হয় যেন আকাশে দোল খাচ্ছে এক বিচিত্র আলোর পর্দা। একে 'মেরুপ্রভা'ও বলা হয়। আর ইংরেজিতে বলা হয় Aurora।

এর দেখা মেলে মূলত মেরু অঞ্চলগুলোতে। আবার দুই মেরুতে একে ডাকা হয় দুই নামে। উত্তর মেরুর অঞ্চলে মেরুর অঞ্চলে উৎপন্ন মেরুজ্যোতিকে বলা হয় কুমেরুপ্রভা। ইংরেজিতে এটি হলো Aurora Australis বা Southern Lights ।

চিত্র-১: আলাস্কা অঞ্চল থেকে ধারণকৃত নর্দার্ন লাইটস বা সুমেরু প্রভার দৃশ্য; ছবিসূত্র: Elizabeth M. Ruggiero, Getty Images/iStockphoto

আকাশের বুকে ফুটে উঠা এ অদ্ভুত সৌন্দর্যের আলোকচ্ছটার পেছনের রহস্যটা কি? আসো সহজ আলোচনায় বিষয়টি তোমাদের জন্য খোলাসা করার চেষ্টা করি।

যদিও আমরা এটি পৃথিবীর বুকে বসে অবলোকন করি, কিন্তু ঘটনার মূল কলকাঠি কিন্তু নড়ে সূর্য থেকে! বলে রাখা ভালো, অরোরা কিন্তু শুধু পৃথিবীতে না, অন্য অনেক গ্রহতে-ও (যেমন: মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি) দেখা যায়।

প্রক্রিয়াটির সূত্রপাত ঘটে সৌর ঝড় বা Solar Flare এর মাধ্যমে। এই সৌর ঝড়গুলো মূলত সূর্যের পৃষ্ঠদেশেই বেশি পরিলক্ষিত হয়। আর এই সৌরঝড়ের সময় সূর্যের করোনা নামক অঞ্চল থেকে প্রচুর চার্জিত কণা বা Plasma নির্গত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

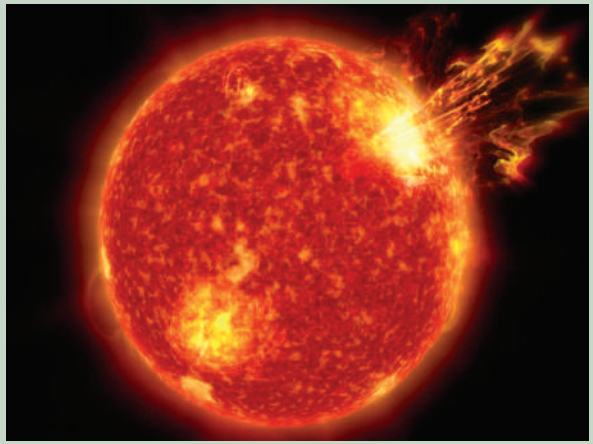

চিত্র-২: সূর্যের পৃষ্ঠ দেশের বিস্ফোরণগুলোকে বলা হয় Solar Flare; ছবিসূত্র: space.com

তো বিষয়টি আরেকটু ভালোভাবে বোঝার জন্য এই সৌর ঝড় বা Solar Flare এর বিষয়টি আরেকটু পরিষ্কার হয়ে নেয়া যাক। এটি মূলত সূর্যের পৃষ্ঠের বিস্ফোরণ। এই বিস্ফোরণগুলো সাধারণত তখনই সংঘটিত হয় যখন সূর্যের ভিতরের বা চারপাশের শক্তিশালী চৌম্বকক্ষেত্রগুলোর পুনঃসংযোজন ঘটে। এই সৌরঝড় কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন ক্ষতির কারণও হতে পারে। এই বিস্ফোরণগুলোকে তাদের শক্তি অনুযায়ী

করোনা হলো সূর্যের বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে বাইরের অঞ্চল। যদিও সূর্যের উজ্জ্বল আলোর কারণে এটি সহজে দৃশ্যমান হয় না। তবে পূর্ণ সূর্যগ্রহণ এর সময় এটি দেখা সম্ভব হয়। তবে বিশেষ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেও এটি দেখতে পারা যায়। মজার বিষয় হলো, এটি সূর্যের বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে বাইরের অঞ্চল হলেও এর তাপমাত্রা কিন্তু অদ্ভুতভাবে সূর্যের পৃষ্ঠের চেয়েও অনেক বেশি।

যথাক্রমে B-Class, C-Class, M-Class Ges X-Class এ বিভক্ত করা হয়। যাদের মধ্যে X-Class বিস্ফোরণগুলো হলো সবচেয়ে শক্তিশালী। এই X-Class বিস্ফোরণগুলোর কারণে এমনকি পুরো পৃথিবীর ডাটা ট্রান্সমিশনে বিভিন্ন সমস্যাসহ পুরো ব্ল্যাক আউট হয়ে যেতে পারে!

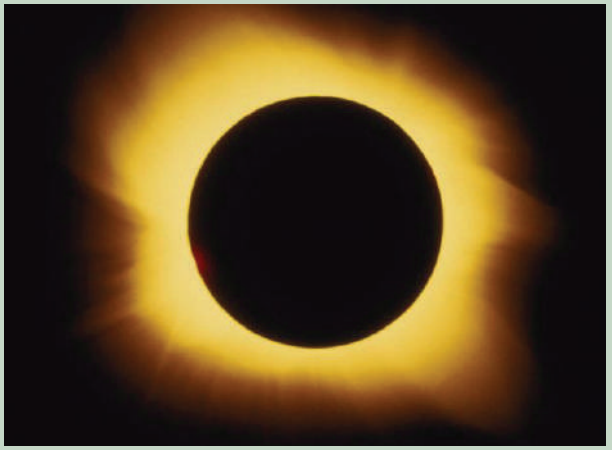

চিত্র-৩: পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় সূর্যের যে বহিঃঅঞ্চলটি দৃশ্যমান থাকে সেটিকেই করোনা অঞ্চল বলা হয়; ছবিসূত্র: https://25hournews.com

আর করোনা সম্পর্কে তো আশা করি তোমাদের সবারই ধারণা আছে তাই না? না, না, এখানে কিন্তু আমি কোভিড-১৯ এর ব্যাপারে কিছু বলছি না। এই করোনা হলো সূর্যের বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে বাইরের অঞ্চল। যদিও সূর্যের উজ্জ্বল আলোর কারণে এটি সহজে দৃশ্যমান হয় না। তবে পূর্ণ সূর্যগ্রহণ এর সময় এটি দেখা সম্ভব হয়। তবে বিশেষ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেও এটি দেখতে পারা যায়। মজার বিষয় হলো, এটি সূর্যের বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে বাইরের অঞ্চল হলেও এর তাপমাত্রা কিন্তু অদ্ভুতভাবে সূর্যের পৃষ্ঠের চেয়েও অনেক বেশি। এই বিষয়ে এখনও বিস্তর গবেষণা চলমান রয়েছে।

তো ঐ চার্জিত কণা অথবা প্লাজমা এরপর সৌরবায়ু বা Solar Wind এর মাধ্যমে মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ে। এই কণাগুলোর আবার (Solar Particles) নিজস্ব চৌম্বকক্ষেত্র থাকে। এই কণাগুলো যখন আসতে আসতে পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রের সংস্পর্শে আসে, তখনই আসল ঘটনার সূত্রপাত ঘটে!

তোমাদের সকলেরই নিশ্চয় জানা আছে, পৃথিবীর নিজস্ব একটা চৌম্বকক্ষেত্র আছে। এই চৌম্বকক্ষেত্রের দিক হচ্ছে দক্ষিণ মেরু থেকে উত্তর মেরুর দিকে। কল্পনার সুবিধার্থে তোমরা গোলাকার একটা পৃথিবীর কথা চিন্তা করতে পারো যার দক্ষিণ মেরু (নিচের দিকে) থেকে কতগুলো রেখা বা তন্তু বের হয়ে পৃথিবীর পৃষ্ঠ বরাবর উপর দিয়ে ঘুরে উত্তর মেরুতে (উপরের দিকে) গিয়ে মিলিত হয়েছে। এটাকেই পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র হিসেবে কল্পনা করে নেয়া যায়।

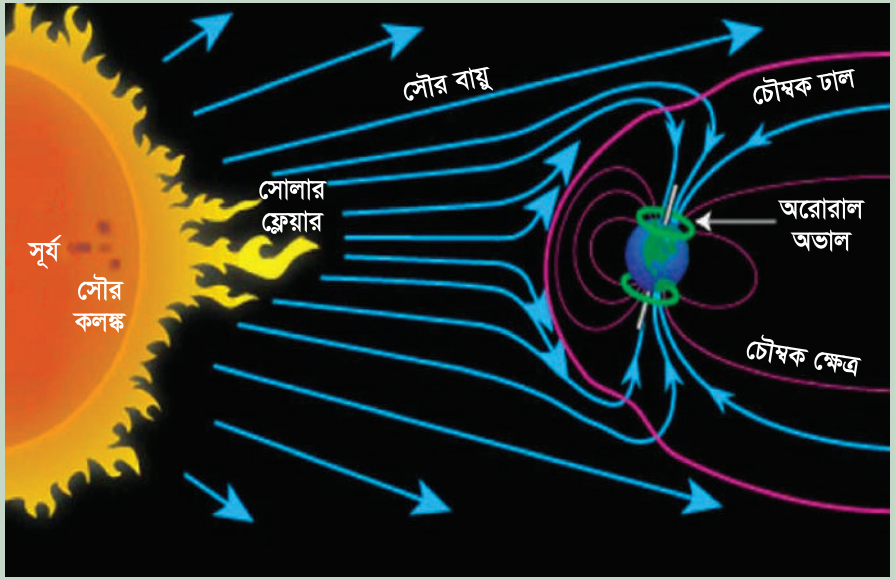

চিত্র-৪: সোলার ফ্লেয়ার এর উপর পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রের প্রভাব

তো ঐ সৌরবায়ু তার মধ্যে চার্জিত কণাসহ পৃথিবীতে আঘাত হানার চেষ্টা করে। এর কারণে কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে। যেমন: পৃথিবীর চারপাশে আবর্তনশীল বিভিন্ন স্যাটেলাইট এর ক্ষতি করতে পারে, পৃথিবীর GPS সিস্টেম এরও ক্ষতি করতে পারে।

কিন্তু এগুলোর কোনটিই হয় না। কারণ, পৃথিবীর চারপাশে যে চৌম্বকক্ষেত্র আছে তা অনেকটা ঢালের মতো কাজ করে। সৌরবায়ুর মাধ্যমে আগত ঐ চার্জিত কণাগুলোর অধিকাংশই অপসারিত বা Deflected হয়ে অন্য দিকে চলে যায়। এর ফলে পৃথিবীতে মারাত্মক কোনো বিপর্যয় দেখা দেয় না।

কিন্তু এই চার্জিত কণাগুলোর মধ্য থেকে কিছু অংশ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। চার্জিত কণাগুলো এবং তাদের চৌম্বকক্ষেত্রের সাথে পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রের প্রতিক্রিয়ায় কণাগুলো পৃথিবীর উঁচু অক্ষাংশের এলাকাগুলোর (উভয় মেরুর কাছাকাছি এলাকা) বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করতে পারে।

এর ফলে এই চার্জিত কণাগুলো বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন উপাদানের সাথে (যেমন: অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি) বিক্রিয়া করে এবং এর ফলে শক্তিরূপে যে ফোটন নির্গত হয় তাকে আমরা বিভিন্ন বর্ণের আলো রূপে দেখি।

চিত্র-৫ ও চিত্র-৬: মনোমুগ্ধকর মেরুপ্রভা সৌন্দর্য যেন অপার্থিব; ছবিসূত্র: wanderingowl.com

তা এই বর্ণের ভিন্নতা কেন হয়? এটি মূলত বায়ুমণ্ডলের কোন উপাদানের সাথে ফোটনগুলো বিক্রিয়া করছে তার উপর নির্ভর করে। যেমন: অক্সিজেনের সাথে প্রতিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হয় লাল এবং সবুজ বর্ণ, নাইট্রোজেনের কারণে নীল বর্ণ ইত্যাদি।

এবার আসো কোথায় গেলে এই অনিন্দ সুন্দর বর্ণালিচ্ছটার দেখা মিলবে সে আলোচনায়। শুরুতেই যেমনটা বলেছি, এটি সাধারণত মেরু অঞ্চলের কাছাকাছি এলাকাগুলোতে দেখা যায়। এই এলাকাগুলো পৃথিবীর উচ্চ অক্ষাংশে অবস্থিত। যেমন: উত্তর গোলার্ধের আলাস্কা, কানাডার উত্তরাঞ্চল, আইসল্যান্ড, নরওয়ে, ফিনল্যান্ড, রাশিয়া, সুইডেন, গ্রিনল্যান্ড ইত্যাদি। দক্ষিণ গোলার্ধের এন্টার্কটিকা, চিলি, আর্জেনটিনা, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি।

মেরুর চারপাশে যে প্রায় গোলাকার অঞ্চল জুড়ে অরোরা দেখা যায় তাকে অরোরাল অভাল (Auroral Oval) বলা হয়। আর যদি তোমরাও এই অপার্থিব আলোক প্রভার স্বাক্ষী হতে চাও, এই অরোরাল অভাল অঞ্চলগুলোর কোথায় ক্যাম্পিং করবে, তা ঠিক রাখতে পারো এখনি।

তথ্যসূত্র:

Aurora: 1) https://youtu.be/OZ5idaNCIgA
2) https://en.wikipedia.org/wiki/Aurora
3) https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%A4%E0%A6%BF
Solar flare : https://youtu.be/oOXVZo7KikE
Corona : https://spaceplace.nasa.gov/sun-corona/en/

জিনেতে কারসাজি

শ ম য়ি তা সা ই দ

১৯৯১ সালে বিজ্ঞানী জেমস ওয়াটসন বলেছিলেন যে, "আমাদের সমাজের অনেকেই এমন আছে যারা আমাদের জিনগত পরিবর্তনকে নিয়ে ভয় পায়। কিন্তু এই ধরনের পরিবর্তন আসলে আমাদের বিবর্তনের ফসল, যা বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন বৈচিত্র্যময় পরিবেশের সাথে আমাদের তাল মিলিয়ে চলতে সাহায্য করেছে। আমরা সবাই কমবেশি ত্রুটিপূর্ণ, তাহলে কেন আমরা আরেকটু ভালোভাবে বাঁচার চেষ্টা করছি না?"

কল্পনা করে নেই যে, একটা দালানের শত হাজার ইটের মাঝে কোন একটিতে ক্ষয় ধরেছে, আর তারই ফলশ্রুতিতে দালানের ভিতে ফাটল ধরেছে। কেমন হয়, যদি সেই ইটের টুকরাটি সরিয়ে সেখানে ভাল একটি ইট দিয়ে আমরা সেই ফাটল মেরামত করে ফেলি? শুনতে ভালো শুনালেও বাস্তবে এই কাজ করাটা বেশ কষ্টসাধ্যই বটে। কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, আমাদের মানব দেহের জিনগত সমস্যা দূর করতেই এমন এক প্রক্রিয়া আছে, যার নাম "জিন থেরাপি!

১৯৯১ সালে বিজ্ঞানী জেমস ওয়াটসন বলেছিলেন যে, "আমাদের সমাজের অনেকেই এমন আছে যারা আমাদের জিনগত পরিবর্তনকে নিয়ে ভয় পায়। কিন্তু এই ধরনের পরিবর্তন আসলে আমাদের বিবর্তনের ফসল, যা বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন বৈচিত্র্যময় পরিবেশের সাথে আমাদের তাল মিলিয়ে চলতে সাহায্য করেছে। আমরা সবাই কমবেশি ত্রুটিপূর্ণ, তাহলে কেন আমরা আরেকটু ভালোভাবে বাঁচার চেষ্টা করছি না?" [১]

এই আরেকটু ত্রুটিহীন ও সুস্থভাবে বাঁচতে আমাদের সহায়তা করতে পারে "জিন থেরাপি"।

জিন থেরাপি কী- তা জানার আগে জিন নিয়ে আমাদের একটু ধারণা থাকা দরকার। এই জিন আমাদের ছোটবেলার রূপকথার বইতে পড়া দত্যি-দানবের জিন নয়। এই জিন হচ্ছে মানুষের বংশগতির ধারক- সোজা কথায় বলতে গেলে মানুষ হিসেবে আমাদের সকল ধরনের বৈশিষ্ট্য- চুলের রঙ থেকে শুরু করে ক্যান্সার বা ডায়বেটিস হওয়ার সম্ভাবনা পর্যন্ত সব কিছুর তথ্য এই জিনের মাঝে থাকে। আর জীবদেহে যেকোনো বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটে জিন থেকে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় প্রোটিন উৎপন্ন হওয়ার মাধ্যমে।

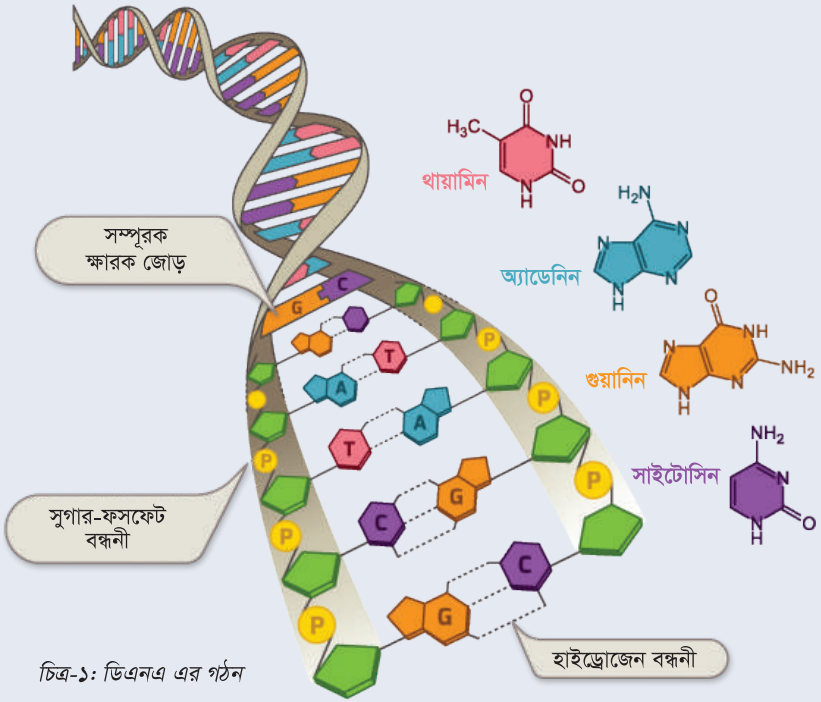

চিত্র-১: ডিএনএ এর গঠন

একটা বিশাল দালান যেমন অনেকগুলো ইটের সমন্বয়ে তৈরি, তেমনি আমাদের জিনগুলো ৮ ধরনের নিউক্লিউটাইডের (অ্যাডেনিন, গুয়ানিন, সাইটোসিন ও থায়ামিন) সমন্বয়ে তৈরি। এই নিউক্লিউটাইড মিলে ডিএনএ তৈরি করে এবং ডিএনএ-তেই আমাদের জিনেরা থাকে। ডিএনএ-তে এই জিন ছাড়াও এমন অনেক সিকোয়েন্স থাকে যাদের থেকে প্রোটিন পাওয়া যায় না। মূলত "সেন্ট্রাল ডগমা"নামক প্রক্রিয়াতে ডিএনএ (জিন সংবলিত অংশ) থেকে আমরা মেসেঞ্জার আরএনএ পাই। ডিএনএ হতে মেসেঞ্জার আরএনএ পাবার এই ধারাকে বলে ট্রানসক্রিপশন"। আর মেসেঞ্জার আরএনএ থেকে আমরা প্রোটিন পাই। এই প্রক্রিয়াকে বলে 'ট্রান্সলেশন'। এই দুটি প্রক্রিয়াই "সেন্ট্রাল ডগমা'-এর অন্তর্গত। ডিএনএর যেসব অংশ থেকে মেসেঞ্জার আরএনএ হয় না, এরা মূলত ছাঁটাই হয়ে যায়। নন- প্রোটিন অনেক অংশই আবার জিনের এক্সপ্রেশন অর্থাৎ সেখান থেকে কতটুকু প্রোটিন হবে এই বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণ করে।

জিন থেরাপিকে সহজ ভাষায় বর্ণনা করতে হলে বলতে হবে যে এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি ভালো জিনের কপিকে দিয়ে রোগের সাথে জড়িত অস্বাভাবিক জিনকে প্রতিস্থাপিত করা হয়। মিউটেটেড/পরিবর্তিত জিনকে সরিয়ে সেখানে সঠিক জিনকে বসিয়ে পরিবর্তিত জিনের ফলে হওয়া রোগের চিকিৎসা আমরা করতে পারি। এখনো চিকিৎসা বিজ্ঞানের এই প্রক্রিয়া ল্যাবরেটরিতেই আবদ্ধ আছে এবং অনেকগুলো ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল আমেরিকা, ইউরোপ এবং অস্ট্রেলিয়াতে হচ্ছে [২]। জিন থেরাপি কাজে লাগিয়ে অনেক ধরনের রোগের চিকিৎসা হতে পারে; যেমন রিসেসিভ জেনেটিক ডিসঅর্ডার (এমন সব রোগ যা বাবা মা দুজনের থেকে পাওয়া ২টি মিউটেটেড জিন/অ্যালিল পাওয়ার কারণে হয়) যেমন- সিস্টিক ফিব্রোসিস, হিমোফিলিয়া, সিকেল সেল এনেমিয়া ইত্যাদি। এছাড়াও ক্যান্সার এবং কিছু কিছু ভাইরাসজনিত রোগ যেমন- এইডস এর চিকিৎসাতেও জিন থেরাপি ব্যবহার করা যেতে পারে। [৩, ৪]

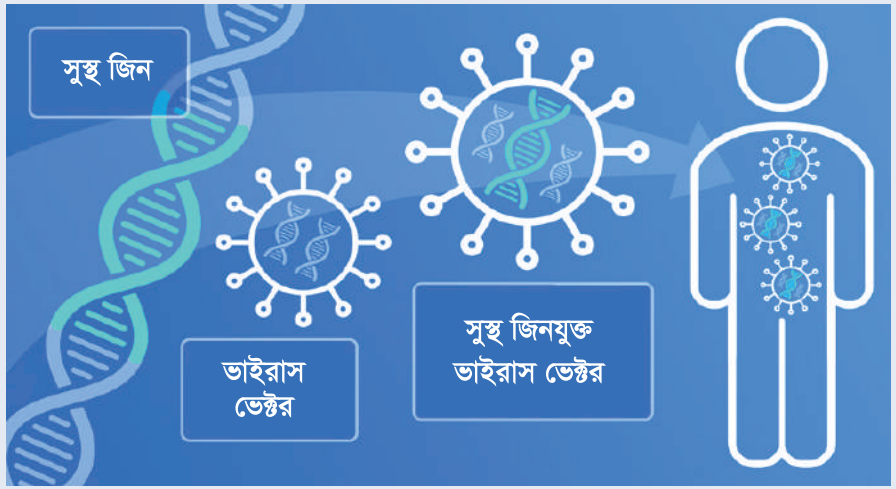

চিত্র-২: জিন থেরাপি

এই থেরাপির ক্ষেত্রে রোগের সাথে সম্পর্কিত মিউটেটেড জিনকে সরিয়ে দিতে জিনের ভালো একটি কপি একটি ভেক্টরের মাঝে ঢুকানো হয় এবং সেই ভেক্টরকে মানুষের দেহে স্থাপন করা হয়। ভেক্টর মূলত বাহকের মত কাজ করে এবং বিভিন্ন ধরনের ভেক্টর পাওয়া যায়। যেমন-

প্লাসমিড, ন্যানোস্ট্রাকচারড বা ভাইরাল। এসবের মাঝে আবার ভাইরাল ভেক্টরকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। এর কারণ হচ্ছে, কোষে প্রবেশ এবং জেনেটিক তথ্য কোষে ছাড়ার ব্যাপারে এটি সবচেয়ে ভালো সক্ষমতা দেখিয়েছে।

বেশ কিছু রকমভেদ প্রচলিত থাকলেও, জিন থেরাপির মূল ধারণাটিকে বাস্তবে কাজে লাগানোর প্রক্রিয়াটি বেশ জটিল। যেই নির্দিষ্ট কোষে চিকিৎসা দরকার সেটি সঠিকভাবে চিহ্নিত করা, চিহ্নিত কোষে জিনের কপিগুলোকে বিতরণ করা এবং মিউটেটেড জিনের জায়গায় নতুন জিনের কপি স্থাপনের ফলে সেটা কিভাবে জিনগত রোগের উপশম করবে সেসব ব্যাপারে আরও গবেষণা দরকার। [৩]

কোষের ধরনের উপর ভিত্তি করে আবার জিন থেরাপিকে ২ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে: দেহকোষ এবং জননকোষ জিন থেরাপি। জননকোষে জিন স্থাপিত করলে সেই পরিবর্তন পরবর্তী প্রজন্মে যায়। অন্যদিকে দেহকোষে জিন স্থাপিত করলে তা পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চালিত হয় না। ভালো জিনের কপিকে সেই নির্দিষ্ট কোষে পৌঁছাতে একটি বাহক (ভেক্টর) লাগে। একটি ভালো দক্ষ ভেক্টরের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য থাকা লাগবে, যেমন একে হতে হবে নির্দিষ্ট, এক বা একাধিক জিনের কপিকে জায়গামত ছাড়ার ক্ষেত্রে পারদর্শী, এটি আমাদের রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থার কাছে ক্ষতিকর হিসেবে চিহিত হবে না এবং এদেরকে বাণিজ্যিকীকরণের জন্য বেশি পরিমাণে বিশুদ্ধীকরণ করা সম্ভব। দেহে প্রবেশ করানোর পরে সেই ভেক্টর যেন আমাদের দেহে

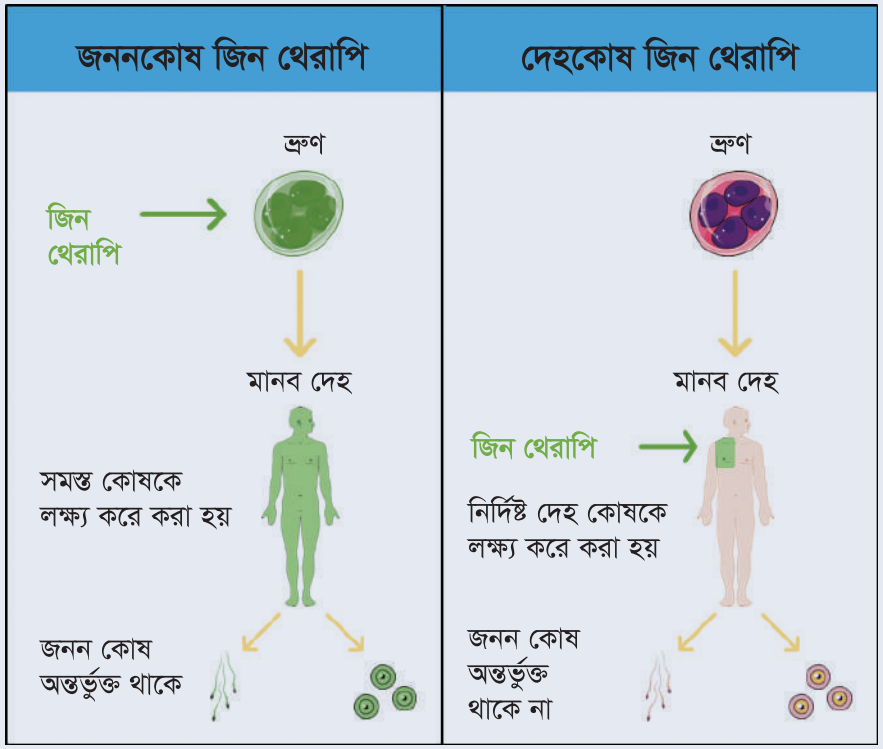

চিত্র-৩: জনন কোষে জিন থেরাপি এবং দেহ কোষে জিন থেরাপি

প্রদাহজনিত কোন ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করতে পারে সেদিকেও খেয়াল রাখা দরকার। জিন থেরাপির ক্ষেত্রে আরেকটা ব্যাপার মাথায় রাখতে হবে যে, মিউটেটেড জিনের যেই কাজগুলো ঠিকভাবে সম্পাদিত না হওয়ার ফলে এই জিনগত রোগটি দেখা গিয়েছিল, থেরাপির ফলে প্রতিস্থাপিত জিন যেন সেই কাজগুলো ঠিকভাবে করে রোগটিকে প্রশমিত করতে পারে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, সুরক্ষা। এই প্রক্রিয়াটি রোগীর জন্য যাতে ক্ষতির কারণ না হয় সেটা যেমন মাথায় রাখতে হবে, পাশাপাশি এটাও খেয়াল রাখতে হবে যে, এর ফলে পরিবেশ বা একে নিয়ে যারা কাজ করছে, তারাও যেন কোন ধরনের ঝুঁকিতে না থাকে। [৬.৭]

কোন ধরনের কোষে জিন স্থাপন করলে সবচেয়ে ভালো ফল হতে পারে, সেই গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, হেমাটোপয়েটিক স্টেম কোষে জিন প্রতিস্থাপন করলে সবচেয়ে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়। কারণ এই কোষগুলোর নিজেকে সংস্কারের ক্ষমতা এবং দীর্ঘজীবিতা জিন থেরাপিতে সবচেয়ে ভালো ফলাফল পেতে সাহায্য করে। তোমাদের নিশ্চয়ই জানা আছে, স্টেম কোষ হচ্ছে সেই ধরনের বিশেষ কোষ যাদের থেকে আমরা বিশেষায়িত বিভিন্ন কোষ পাই। আর হেমাটোপয়েটিক স্টেম কোষ হচ্ছে সেই ধরনের স্টেম কোষ যা থেকে আমরা বিভিন্ন ধরনের রক্তকোষ পাই, যেমন- লোহিত রক্তকণিকা, শ্বেত রক্তকণিকার বিভিন্ন রকমভেদ ইত্যাদি। জিন থেরাপি এবং স্টেম কোষকে কাজে লাগিয়ে 'ইনডিউসড/প্রভাবিত প্লুরিপটেন্ট স্টেম কোষ' নামক এক ধরনের বিশেষ ধারণার আবির্ভাব হয়েছে, যার সাহায্যে আমরা বিশেষায়িত কোষ থেকে পুনরায় স্টেম কোষ পেতে পারি। যেমন লিভার/যকৃতের বিশেষায়িত কোষ হচ্ছে হেপাটিক কোষ যাকে পুনরায় স্টেম কোষে পরিবর্তিত করলে, এদেরকে বলা হবে, 'ইনডিউসড/প্রভাবিত প্লুরিপটেন্ট স্টেম কোষ'। এমন সব রোগী যারা দীর্ঘসময় ধরে লিভারের রোগে ভুগছে অথবা যাদের ভাইরাসজনিত হেপাটাইটিস বি অথবা সি-এর সংক্রমণ আছে, তাদের অনেকের ক্ষেত্রেই লিভারের অবস্থা এতই দুর্দশাগ্রস্ত হয় যে, তাদের "লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্ট/প্রতিস্থাপন" করা লাগে। সেক্ষেত্রে যকৃতের বিশেষায়িত সুস্থ পরিণত হেপাটিক কোষ থেকে আমরা 'ইনডিউসড/প্রভাবিত প্লুরিপটেন্ট স্টেম কোষ' তৈরি করে তা থেকে একটি সুস্থ লিভার পেতে পারি। এই নতুন কোষগুলো হেপাটাইটিস ভাইরাস দিয়ে যাতে আর সংক্রমিত না হয়, তা নিশ্চিত করতে ভাইরাসের জিনোমের প্রতিপক্ষ হিসেবে ছোট 'হেয়ারপিন আরএনএ'কে ভেক্টরের মাধ্যমে দেহে ঢুকাতে পারি যা পুনঃসংক্রমণ হতে রোগীকে সুরক্ষা দিতে পারে। [৮]

১৯৮০ সালের দিকে, ই কোলাই ব্যাকটেরিয়ার জিনোমে বেশ অদ্ভুত প্যাটার্নের দেখা মেলে। এখানে দেখা যায় যে, বৈচিত্র্যময় একটি সিকোয়েন্স 'রিপেটিটিভ সিকোয়েন্স' এর মাঝে রয়েছে। ২০০৫ সালে এই সিদ্ধান্তে আসা হয় যে, এই বৈচিত্র্যময় সিকোয়েন্সটি ব্যাক্টেরিয়ার নিজের না, বরং এটা তাকে আক্রমণকারী ব্যাক্টেরিয়াফেজ ভাইরাস থেকে আসে এবং ভাইরাস জিনোমের স্মৃতি হিসেবে ব্যাক্টেরিয়ায় থেকে যায়। ফলে আরেকবার এই ফেজের আক্রমণ ঘটলে ব্যাক্টেরিয়ার প্রতিরক্ষা ব্যাবস্থা খুব সহজেই এই ফেজ ভাইরাসকে প্রতিহত করতে পারে। এই আবিষ্কারই বর্তমানের নোবেল-বিজয়ী চাঞ্চল্যকর 'ক্রিসপার-কাস' ধারণার সূত্রপাত করেছে। এই ক্রিস্পার প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে "জিন এডিটিং"এর জগতে ব্যাপক সাড়া পড়ে গিয়েছে। এতে জিনের পরিবর্তিত অংশকে কেটে বাদ দিয়ে সেখানে ভালো কপি বসানো হয়। এই পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া এবং ইউনিভার্সিটি অব উটাহের বৈজ্ঞানিকেরা হিমগ্লোবিন জিনের সংশোধন করে "সিকল সেল এনেমিয়া"রোগকে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছে। [৯]

জিন থেরাপি, জিন এডিটিং চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী এক ধারণা। অনেক বিজ্ঞানী একে সমর্থন জানালেও, নৈতিক বিষয় চিন্তা করে এই নিয়ে বিজ্ঞানীসমাজে এবং সাধারণ মানুষের মাঝেও অনেক বিতর্ক হয়েছে। ২০১৫ সালে একদল চাইনিজ বিজ্ঞানী "ক্রিসপার-কাস, কাজে লাগিয়ে প্রথমবারের মত মানবভ্রুণে জিনগত পরিবর্তন আনতে সক্ষম হন [১০]। একই পদ্ধতি কাজে লাগিয় আরেক দল চাইনিজ বিজ্ঞানী এইডস রোগ সৃষ্টিকারী এইচআইভি ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধকতা তৈরিতে সফলতা পান। ২৬ টি ভ্রুণের মাঝে ৪ টিতে সফলতা আসে, এবং বাকিগুলো নষ্ট হয়ে যায়। এর থেকে বোঝা যায় যে, এই পদ্ধতির নিঃসন্দেহে আরো পরিবর্তন এবং পরিমার্জন দরকার [১১]। মানবভ্রুণ নষ্ট হওয়ার বিষয়টি অনেক চাঞ্চল্যের জন্ম দিয়েছে। জাপানি এথিকাল কমিটি এই সিদ্ধান্ত দেয় যে, এই পরীক্ষণটি কোন নৈতিকতার পরিপন্থি নয়, অন্যদিকে আমেরিকান বিজ্ঞানীরা এখনি এই পদ্ধতি অবলম্বন করে মানবভ্রুণে জিনগত পরিবর্তন আনতে রাজি নন। [১১] এ ধরনের নতুন বিস্ময়কর আবিষ্কার এবং প্রযুক্তির দেখা হয়ত অদূর ভবিষ্যতে আরও মিলবে। জিন এডিটিং এবং থেরাপির মাধ্যমে আমরা "সুপার হিউম্যান" তৈরি করে বিপদ ডেকে আনব কি না- এসব জল্পনা- কল্পনার অবসান সেই অদূর ভবিষ্যতের জন্যেই তোলা থাকলো। [১২] ■

রেফারেন্স:

১. *Mukherjee S. Genetic therapies: posthuman gene therapy. In: Mukherjee S. The gene: an intimate history. Nova York: Scribner; 2016. Chap. 34. p. 415.*
২. *Linden R. Gene therapy: what it is, what it is not and what it will be. Estud Av. 2010;24(70):31-69.*
৩. *Misra S. Human gene therapy: a brief overview of the genetic revolution. J Assoc Physicians India. 2013;61(2):127-33. Review*
৪. *Ginter EK. [Gene therapy of hereditary diseases]. Vopr Med Khim. 2000; 46(3):265-78. Review. Russian*
৫. *Mathews QL, Curiel DT. Gene therapy: human germline genetics modifications assessing the scientific, socioethical, and religious issues. South Med J. 2007; 100(1):98-100.*
৬. *Bank A. Human somatic cell gene therapy. Bioessays. 1996;18(12):999-1007. Review*
৭. *Gardlík R, Pálffy R, Hodosy J, Lukács J, Turna J, Celec P. Vectors and delivery systems in gene therapy. Med Sci Monit. 2005;11(4):RA110-21. Review*
৮. *Kay MA. State-of-the-art gene-based therapies: the road ahead. Nat Rev Genet. 2011;12(5):316-28. Review.*
৯. *Marraffini LA, Sontheimer EJ. CRISPR interference: RNA-directed adaptive immunity in bacteria and archaea. Nat Rev Genet. 2010;11(3):181-90. Review.*
১০. *Tebas P, Stein D, Tang WW, Frank I, Wang SQ, Lee G, et al. Gene editing of CCR5 in autologous CD4 T cells of persons infected with HIV. N Engl J Med. 2014;370(10):901-10.*
১১. *Callaway E. Second Chinese team reports gene editing in human embryos. Nature. 2016; 08 April 2016. doi:10.1038/nature.2016.19718.*
১২. *Gonçalves GAR, Paiva RMA. Gene therapy: advances, challenges and perspectives. Einstein (Sao Paulo). 2017 Jul-Sep;15(3):369-375. doi:10.1590/S1679-45082017RB4024. PMID: 29091160; PMCID: PMC5823056.*

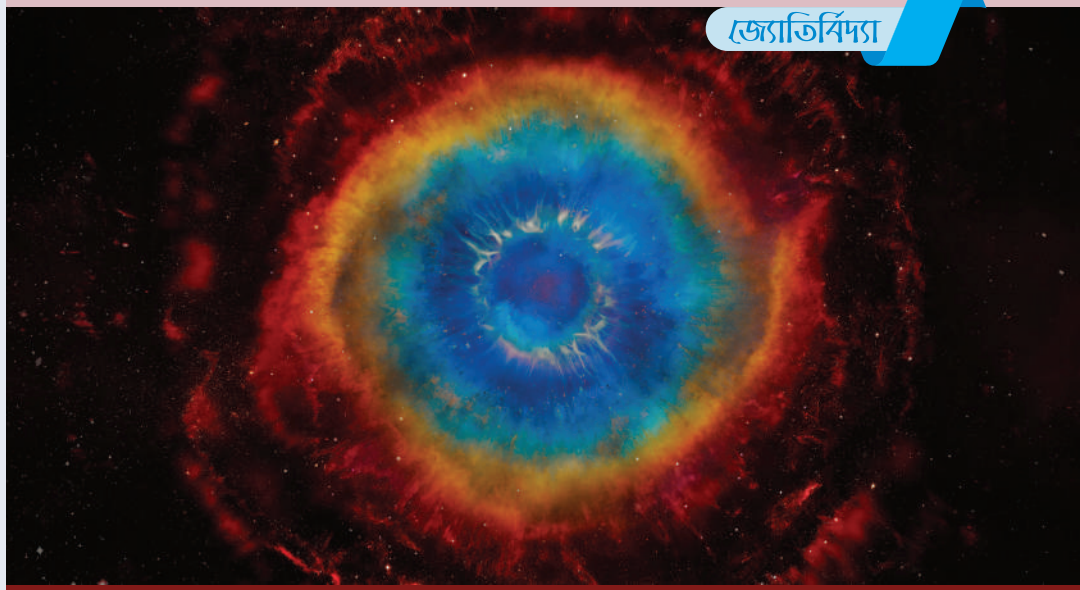

TOURING THE COSMOS

মা য়ি শা ফা র জা না

- কি রে, নিলু! আকাশের দিকে তাকিয়ে মন খারাপ করে বসে আছিস কেন?

নিহনের হঠাৎ প্রশ্নে নিলু যেন সম্বিত ফিরে পেলো। "ইশ্ রে নিহন! আমার যদি একটা প্লানেটেরিয়াম থাকতো! তুই তো জানিস আমার আকাশ দেখতে কত্ত ভালো লাগে!"

- ও- এই কথা! প্লানেটেরিয়াম নেই তো কি হয়েছে প্লানেটেরিয়াম সফটওয়্যার তো আছে।

- ধুর! প্লানেটেরিয়াম কিনতে যেমন টাকা লাগবে, প্লানেটেরিয়াম সফটওয়্যার কিনতেও তো তেমন টাকা লাগবে!

- আরে বোকা- ওপেন সোর্স লাইসেন্সের আওতায় অনেক প্লানেটেরিয়াম সফটওয়্যার বিনামূল্যে পাওয়া যায়- যেগুলো এমন কি তুই তোর মোবাইল ফোনেও ব্যবহার করতে পারবি। অন্য কোন ডিভাইস যেমন কম্পিউটার বা ল্যাপটপেরও প্রয়োজন হবে না।

- কি বলিস! জানতাম না তো! নিলু অবাক হয়ে গেলো ।

নিহন বলতে থাকলো, "এমনকি খোদ গুগলও যুক্তরাষ্ট্রের কার্নেগি মেলন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যৌথ উদ্যোগে স্কাই ম্যাপ নামে একটি প্লানেটেরিয়াম সফটওয়্যার ডেভেলপ করেছে- সেই ২০১২ সালে। স্কাই ম্যাপকে অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইসের জন্য "হাতে ধরে রাখার উপযোগী প্লানেটেরিয়াম বলতে পারিস- যেখানে তুই তারা, গ্রহ, নীহারিকাসহ আরো অনেক কিছু শনাক্ত করতে পারবি, এমনকি তোর মোবাইল ফোনে যদি বিল্টইন কম্পাস থাকে তাহলে তোর

ওরিয়েন্টেশন অনুযায়ীও আকাশ পর্যবেক্ষণ করতে পারবি"।
- "ওহ্! তাহলে এসবের জন্য নিশ্চয়ই অনেক শক্তিশালী ইন্টারনেট সংযোগ লাগবে?" নিলুকে বেশ হতাশ দেখালো।
- নিহন এবার নিলুকে আশ্বস্ত করে বলল, "আরে! না- না, তেমনটি নয়! বিশেষ কিছু ফিচার যেমন, লোকেশন ম্যানুয়ালি কাজ করবে না। সে ক্ষেত্রে ইন্টারনেট সংযোগ ছাড়াও জিপিএস ব্যবহারের মাধ্যমে বা তোর নিজের অক্ষাংশ- দ্রাঘিমাংশ ব্যবহার করে অতি সহজেই নির্বিঘ্নে অ্যাপটি ব্যবহার করতে পারবি"।
-নিলু খুশি হয়ে বললো, "দারুণ! তাহলে তো একেবারে রিয়াল টাইম আকাশ পর্যবেক্ষণ করা যাবে!"
- আরও মজার কিছু জানতে চাস?
- নিশ্চয়ই! বলে ফেল শিগগিরই!
- শুধু যে স্কাই ম্যাপ এর মত সফটওয়্যার আছে তা নয়, এমন ওয়েবসাইট আছে যার মাধ্যমে তুই যেখানে আছিস ঠিক সেখানে সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ বা বিশেষ কোন গ্রহ-নক্ষত্র পর্যবেক্ষণের সঠিক সময়সহ যেকোনো জ্যোতির্মণ্ডলীয় বা মহাজাগতিক ঘটনার সঠিক সময় অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশসহ জানতে পারবি!
- বাহ্! প্রযুক্তি বিজ্ঞানকে জানা যেন আরও সহজ করে দিয়েছে। তা- ওয়েবসাইটটির নাম কি?
- টাইম অ্যান্ড ডেট (https://www.timeanddate.com/astronomy/)।
-ধন্যবাদ- অনেক অনেক ধন্যবাদ!
নিহন কিন্তু আরো বেশ কিছু ওপেন সোর্স প্লানেটেরিয়াম সফটওয়্যার ও স্টারগেজিং অ্যাপসের কথা জানে (তাই সে তোমাদেরও জানাতে চায়)। যদিও এগুলো বাণিজ্যিক সফটওয়্যার Starry Night বা Slooh এর মত অতটা মোহনীয় নয়, তবুও এই ফ্রি সফটওয়্যারগুলো কোন অংশেই কম ভালো নয়! তো চলো, তাঁর কাছ থেকে এমন কিছু সফটওয়্যার এর খোঁজ জেনে নেই।

Asynx: এটি শুধু ফ্রি প্লানেটেরিয়াম নয়, সোলার সিস্টেম সিমুলেটরও। এর সাহায্যে পৃথিবীর যেকোন অবস্থান থেকে ১৭৬০-৯৯৯৯ সাল পর্যন্ত যেকোনো সময়ের আকাশ পর্যবেক্ষণ করা যাবে। যে কোন স্তরের শিক্ষার্থী, এমনকি শিশুদের জন্যও এটি বিশেষ উপযোগী। মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি সম্পর্কে জানার জন্য এর চেয়ে ভালো আর কোন মাধ্যম হতেই পারে না!

Celestia: এটি একটি ইন্টারেক্টিভ প্ল্যানেটেরিয়ামের চেয়েও বেশি কিছু। এই সফটওয়্যারটি যারা সৌরজগৎ এবং এর বাইরেও দৃষ্টিপাত করতে চাও তাদের জন্য খুব চিত্তাকর্ষক। এটি থ্রি-ডি স্পেস সিমুলেটর বৈশিষ্ট্যযুক্ত। এটি শিক্ষক এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান যোগাযোগকারীদের কাছে খুব জনপ্রিয়। সফটওয়্যারটি উইন্ডোজ, লিনাক্স এবং ম্যাক ওএস এ চলে। পেতে পারো এই ঠিকানা থেকেও- https://celestia.space/।

Stellarium: স্টেলারিয়াম হল ওয়ান্ডারডমের প্রিয় সফটওয়্যার যা তোমরা তোমাদের উপস্থিত সময় ও স্থানের আকাশ পর্যবেক্ষণ ও উপস্থাপনায় ব্যবহার করতে পারো। এটি তোমার অবস্থান থেকে রাতের আকাশ দেখায়। নক্ষত্রমণ্ডল, উল্কা ঝরনা, উপগ্রহ, গভীর আকাশের বস্তু এবং আরও অনেক কিছু। তুমি জুম-ইন করতে পারো, বিস্তারিত তথ্যের জন্য পৃথক বস্তুতে ক্লিক করতে পারো এবং পর্যবেক্ষণের তথ্য সংরক্ষণের লগ বইটিও রাখতে পারো! সফটওয়্যারটি উইন্ডোজ, লিনাক্স এবং ম্যাক ওএস এ চলে। এর অনলাইন সংস্করণ ক্রোমবুক ব্যবহারকারীদের

জন্যও খুব কার্যকর। পাশাপাশি স্টেলারিয়ামের প্রিমিয়াম মোবাইল সংস্করণ রয়েছে। পেতে পারো এই ঠিকানায়- https://stellarium.org/।

চিত্র-১: স্টেলারিয়াম ব্যবহার করে প্রাপ্ত ম্যাপ!

Sky Safari: এর সুন্দর ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক, উজ্জ্বল রঙ এবং নক্ষত্রমণ্ডলের অঙ্কনগুলির কারণে বাচ্চাদের জন্য এটি একটি দুর্দান্ত অ্যাপ। এতে আকাশের জিনিসগুলি এবং সেগুলি কিভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায় সে সম্পর্কে প্রচুর তথ্য রয়েছে। এর "tonight at a glance" বৈশিষ্ট্যটি তোমাদের গ্রহ এবং চাঁদের অবস্থান ও উদয়াস্তের নির্ধারিত সময়গুলি বলে দেবে।

SkEye (Android): এটি আরেকটি প্ল্যানেটেরিয়াম অ্যাপ, যা স্টারগেজার এবং অপেশাদার টেলিস্কোপ ব্যবহারকারীদের মধ্যে সুপরিচিত এবং বেশ জনপ্রিয়। তোমার ফোন বা ট্যাবলেট কোনও স্কোপে মাউন্ট করার মাধ্যমে এটি তোমার টেলিস্কোপটিকে ক্যাটালগ থেকে কোনও নির্দিষ্ট অবজেক্টে গাইড করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। এতে তিনটি রঙের অপশন (দিন, সন্ধ্যা, রাত) আছে যা পর্যবেক্ষককে তাদের সময়ের সাথে অভিযোজিত দৃষ্টি (night adapted vision) রক্ষা করতে সহায়তা করে।

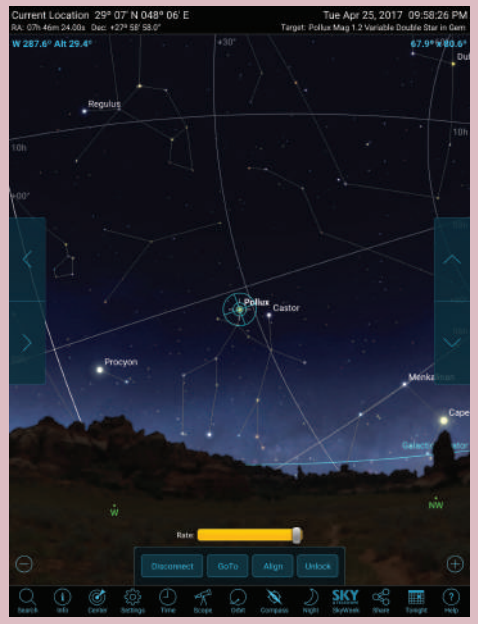

চিত্র-২: স্কাই সাফারি দিয়ে মহাকাশ পর্যবেক্ষণ

Sky Chart/Cartes du Ciel: তারা এবং নীহারিকার অনেক তথ্য ব্যবহার করার মাধ্যমে এই প্রোগ্রামটি তোমাকে স্কাই চার্ট আঁকতে সাহায্য করে। এছাড়াও গ্রহ, গ্রহাণু এবং ধূমকেতুগুলির অবস্থানও এতে প্রদর্শিত হয়। এই প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য একটি নির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণের জন্য বিভিন্ন আকাশের মানচিত্র প্রস্তুত করা। প্যারামিটারগুলি তোমাকে নিদিষ্ট বা স্বয়ংক্রিয়ভাবে কোন ক্যাটালগগুলি ব্যবহার করতে হবে তা বেছে নিতে সহায়তা করে, তারার এবং নীহারিকার রঙ এবং মাত্রা, গ্রহগুলির উপস্থাপনা, লেবেলগুলির সমন্বয় এবং গ্রিডের চিত্র প্রদর্শন, চিত্রের উৎসাহ, দৃশ্যমানতার শর্ত এবং আরও

এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি এই মহাজাগতিক মানচিত্রকে প্রচলিত প্ল্যানেটেরিয়ামের থেকেও যেন আরও সম্পূর্ণ করে তোলে।

Night Vision: নাইট ভিশন এমন একটি "প্ল্যানেটেরিয়াম প্রোগ্রাম যা পৃথিবীর যে কোনও অবস্থান থেকে আকাশকে প্রদর্শন করবে। এখান থেকে স্টার চার্টগুলি মুদ্রিত করা যায়। তবে এর সবচেয়ে মজার ফিচার হল, এতে পর্যবেক্ষণের সময়কে বিভিন্ন ভাবে সেট করা যেতে পারে- এমনকি অতীতেও!

Orbiter: আরেকটি ফ্রি এবং সহজবোধ্য প্ল্যানেটেরিয়াম সফটওয়্যার হল অরবিটার। এই সফটওয়্যারটির সাহায্যে তুমি ফ্লাইট সিমুলেশন ব্যবহার করে মহাকাশে উড়ে যাবে এবং তাই এটি একটি পাইলটের দৃষ্টিকোণ থেকে মহাকাশ মিশনগুলি অন্বেষণ করার মত উত্তেজনার অভিজ্ঞতা দেয়। ইন্টারপ্ল্যানেটারি অভিযান পরিকল্পনা করা, ঐতিহাসিক মহাকাশযানগুলি পুনরায় তৈরি করা, নিজের রকেট ডিজাইন করা সহ এটি ব্যবহার করে আরও বেশ কয়েকটি কাজ করার সুযোগ রয়েছে।

Aladin Sky Atlas: আলাদিন স্কাই অ্যাটলাসের সাহায্যেও তুমি অনেক কিছুই করতে পারো। Simbad database, Hubble images, VizieR এবং আরও অনেক কিছুর মতো বেশিরভাগ জ্যোতির্বিদ্যার সার্ভারগুলিতে অ্যাক্সেস পেতে সহায়তা করে। এছাড়াও, সফটওয়্যারটি ব্যবহারকারীকে জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত চিত্রগুলি এবং জ্যোতির্বিদ্যার ডাটাবেস থেকে সুপারিম্পোজ এন্ট্রি দেখতে সক্ষম করে।

Win Orbit: এই সইটওয়্যারটি কৃত্রিম উপগ্রহের পৃথিবী হতে দূরত্ব, ভারবহন এবং উচ্চতা সম্পর্কিত তথ্যসহ অবস্থান জানাবে। এ তথ্যগুলো ম্যানুয়াল, সিমুলেশন মোডে বা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা যেতে পারে ।

WWT: এই সফটওয়্যারটি ব্যবহার করা সহজ, World Wide Telescope তোমাকে মহাকাশ ভিত্তিক দূরবীন থেকে এবং স্থলভাগের চিত্রগুলি একত্রিত করে মহাকাশ অনুসন্ধানে সহায়তা করবে। প্ল্যানেটেরিয়ামটি ওয়েব ক্লায়েন্ট এবং উইন্ডোজ ক্লায়েন্ট উভয়ের সাথেই তোমাকে আকাশের সুস্পষ্ট ঝলক পেতে এবং থ্রিডি ইমেজ তুলতে সহায়তা করবে।

বেশ অবাক করা হলেও এটি সত্য যে, এই তালিকা আসলে আরো লম্বা! কার্ল সাগান বলেছিলেন, "Some where, something incredible is waiting to be known." তাহলে আর দেরি না করে অজানাকে জানার প্রচেষ্টা শুরু করা যাক! হ্যাপি এক্সপ্লোরিং!

Facebook.com/byaponsm

বাংলা ফন্ট: জন্ম থেকে বর্তমান

মু হা ম্মা দ

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের নানা প্রয়োজনেই প্রায় সার্বক্ষণিকভাবেই আমরা সকলে বাংলা বর্ণমালাগুলোকে নানান ভাবে ব্যবহার করছি। কথা বলার সময় কিভাবে বর্ণমালা ফুসফুস, কণ্ঠনালী, জিহ্বা পেরিয়ে মুখ থেকে কথা হয়ে বেরিয়ে আসে তা আমরা কমবেশি জানি। কিন্তু লিখিত রূপ এর পিছনের প্রযুক্তিটা? না, কলম বা পেন্সিল ব্যবহার করে হাত ঘুরিয়ে লিখন এর কথা বলছি না আজ। বরং আজকে আলোচনা করব এইযে ম্যাগাজিন থেকে শুরু করে টিভি, মোবাইল, কম্পিউটার, পত্রিকা, ব্যানার-ফেস্টুন, পাঠ্যবই এ আজ সাবলীল বাংলার ব্যবহার করতে পারছি তার পেছনের প্রযুক্তিটা নিয়ে।

আগেকার যুগে মোবাইল-কম্পিউটার তথা ডিজিটাল কোনো মাধ্যম ছিল না। কিন্তু ছিলো বই/পত্রিকা ইত্যাদি। তখন এগুলো ছাপা হতো ছাপাখানায়, প্রিন্টিং প্রেসে। ছোট কাজ এ টাইপরাইটার ব্যবহার হত। ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে চার্লস উইলকিন্স বাংলা অক্ষরের আদলে বাংলা হরফ তৈরি করেন এবং হুগলিতে প্রথম বাংলা মুদ্রণযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। উইলিয়াম কেরি উইলিয়াম ওয়ার্ড ও ম্যার্শম্যানের সহযোগে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার নিকটবর্তী শ্রীরামপুরে ব্যাপ্টিস্ট মিশনে বাংলা মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন করেন। বাংলা টাইপ সহযোগে সর্বপ্রথম বাংলা ব্যাকরণ মুদ্রণ করেন-ন্যাথনিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড। পুরাতন ছাপাখানার সে সময়কার এ কাজগুলো ছিলো কষ্টকর ও সময়সাপেক্ষ। কিন্তু সেই টাইপরাইটার বা মুদ্রণযন্ত্র কিভাবে কাজ চালাতো তা নিয়ে আজকের আলোচনা নয়। বরং আজ মূলত জানাবো ডিজিটাল কাজে বাংলা বর্ণমালার ব্যবহার হচ্ছে, তার পেছনের বিজ্ঞান ও বাংলা ফন্ট এর ইতিহাস।

বাংলা বর্ণমালা ডিজিটাল মাধ্যমে ব্যবহার এর জনক, প্রথম বাংলা ফন্ট এর উদ্ভাবক হলেন প্রকৌশলী সাইফুদ্দাহার শহীদ। তাঁর জীবনী নিয়ে বিশদ আলোচনা আগামী দিনের জন্য তোলা রইল, আজকে কেবল তাঁর বাংলা ফন্টের কৃতিত্বের উপর সংক্ষেপে আলোকপাত করতে চাই। দেশ স্বাধীন এর পর নতুন গঠিত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বেক্সিমকোতে চাকরি করতেন তিনি। ১৯৭৪ সালে উনার চাকরির সুবাদে প্রথম বিদেশে যাবার সুযোগ হয়। সেখানে চারিদিকে উনি কম্পিউটারের ব্যবহার দেখেন। ব্যক্তিগত আগ্রহ থেকে ১৯৮০ তে তিনি বিলেতে বসে একটি ৮ কিলোবাইট রম এর ZX-81 মডেলের কম্পিউটার সংগ্রহ করেন। তাতে সিনক্লিয়ার বেসিক নামের একটি প্রোগ্রামিং ভাষা ছিল। বাংলাকে ডিজিটাল মাধ্যমে ব্যবহারযোগ্য করতে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠেন। তিনি তাঁর কম্পিউটারটির সাথে একটা ১৬ কিলোবাইট মেমরি এক্সটেনশন যোগ করে মহা উৎসাহে প্রোগ্রামিং-এর কাজে লেগে যান। স্ক্রিনে বাংলায় একটি "ব" লিখতেই প্রায় সমস্ত মেমোরি লেগে যায়। বুঝতেই পারছো, এখনকার মত প্রথমদিকের কম্পিউটারগুলো ইংরেজি ব্যতীত কোনো ভাষাই সাপোর্ট করত না। অর্থাৎ তিনি কিবোর্ডের ব তে ক্লিক করে ব লিখেননি। লাইন লাইন কোড লিখে একটি বর্ণ লিখেছিলেন আর তাতেই মেমোরি ফুল! আর এটাই ছিল ইতিহাসে কোনো ডিজিটাল যন্ত্রে প্রথম বাংলার ছোঁয়া। উনার কোম্পানি তে হিসাব রাখার জন্য তখনকার ৬০০০ ডলার খরচ করে আমেরিকার তৈরী পিসি আর্কাইভ কম্পিউটার কেনা হল। কম্পিউটার এর সাথে সাথে পিচ-ট্রির তৈরী অ্যাকাউন্টিংয়ের সফটওয়ার আসলো। পিচ-ট্রি সফ্টওয়্যারটি লেখা হয়েছিল বেসিক ল্যাংগুয়েজে। ফলে সোর্স-কোড ইন্টারপ্রেটারের সাহায্যে এই প্রোগ্রাম ব্যবহার করতে হতো। খুবই ধীরগতিতে চলতো এই প্রোগ্রাম। কোম্পানির ট্রানজেকশন পোস্টিং করার পর ট্রায়াল-ব্যালান্স পেতে উনারা সারা রাত কম্পিউটার চালু করে রেখে দিতেন। এক লাইন প্রিন্ট করার পর কয়েক মিনিট চুপ-চাপ বসে থাকতো কম্পিউটার-

ভাব খানা যেন চিন্তা করছে এর পর কি লিখবে- তার পর আবার আর এক লাইন লিখে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। আমেরিকান নিয়মে সংখ্যা লেখা হতো মিলিয়ন, হাজার, ইত্যাদির পর, চিহ্ন দিয়ে। অথচ বাংলাদেশে আমরা সংখ্যা লিখি কোটি, লাখ, হাজার, ইত্যাদির পর কমা (‘,’) ব্যবহার করে। উনাকে একজন প্রশ্ন করলো এই ব্যাপারটা ঠিক করা যাবে কিনা। আত্মবিশ্বাসী সাইফ উত্তর দিলেন "কেন যাবে না"? যদিও পরে তিনি দেখলেন হাজার হাজার লাইন সোর্স-কোড চেক করতে হচ্ছে। তবে এর মাধ্যমে তিনি প্রোগ্রামিং সম্পর্কে আরও গভীর ধারণা অর্জন করতে সক্ষম হলেন।

উনাদের অফিসে তখন একটা বাংলা টাইপ-রাইটার ছিল- তবে ব্যবহার খুব একটা হতো না। উনি একদিন তাতে একটি চিঠি লিখতে গিয়ে দেখলেন উনার নিজের নামটিই ঠিক ভাবে লেখা যাচ্ছেনা। ‘সাইফু’ পর্যন্ত লিখে অনেক চেষ্টা করেও একটা ভাল ‘দ্দ’ লিখতে সক্ষম হলেন না। এটি ছিল মুনির-অপটিমা টাইপ-রাইটার। এই সমস্যার কোন সহজ সমাধান বের করতে পারলেন না। তখন হঠাৎ খেয়াল হল - আচ্ছা কম্পিউটার দিয়ে কেন আমরা বাংলা লিখিনা? তখনকার দিনে এটার কোন ব্যবসায়িক সম্ভাবনা ছিল না - কারণ কম্পিউটারের মূল্য সাধারণের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে। তাই উনার এই প্রচেষ্টার কথা তেমন কাউকে না জানিয়েই নিজে থেকে এর উপর কাজ শুরু করলেন। চাকরির সুবাদে জাপান যাওয়ায় ওখানকার একটি কম্পিউটার কোম্পানির প্রেসিডেন্ট উনাকে বাংলায় ব্যবহৃত অক্ষর এর তালিকা, প্রতি অক্ষর এর সমআকৃতির ডিজাইন এবং বাংলা কি-বোর্ডের একটি লে-আউট তৈরি করার জন্য নিযুক্ত করলেন। একটা মোটা রেজিস্ট্রি খাতাতে উনারা বাংলা অক্ষরের তালিকা লিপিবদ্ধ করতে থাকলেন। প্রায় ৭০০ অক্ষরের তালিকা হয়ে গেল। এর পর দেখলেন নতুন অক্ষর সহজে খুঁজে পাচ্ছেন না। ঘোষণা করে দিলেন উনাদের তালিকার বাইরে বিদ্যমান কোন নতুন যুক্তাক্ষরের খোঁজ দিতে পারলে ১০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। আরও নতুন কিছু যুক্তাক্ষরের খোঁজ পেলেন এভাবে। তারপর পুরস্কারের অঙ্ক বাড়িয়ে ২০ টাকা করলেন। এভাবে শেষ পর্যন্ত প্রায় ১২০০ যুক্তাক্ষরের তালিকা প্রস্তুত হল। এই তালিকা অনুযায়ী স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, যুক্তাক্ষরগুলি ও স্বর-চিহ্ন গুলি (ডিজাইন) করা শুরু করলেন উনার আর্টিস্ট বন্ধু আশরাফ।

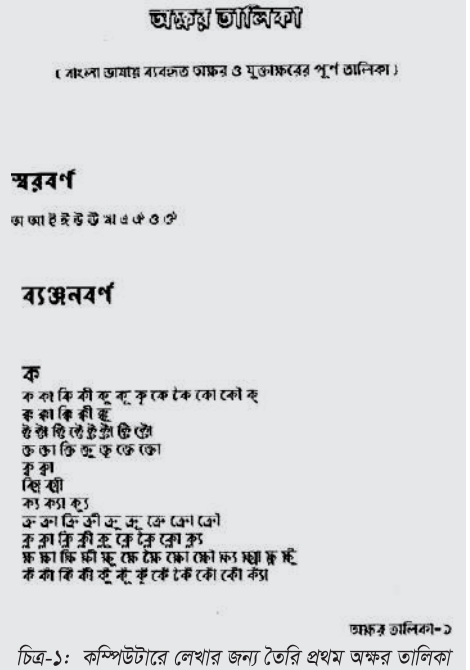
অক্ষর তালিকা

(বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত অক্ষর ও যুক্তাক্ষরের পূর্ণ তালিকা)

স্বরবর্ণ

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ

ব্যঞ্জনবর্ণ

ক

অক্ষর তালিকা-১

চিত্র-১: কম্পিউটারে লেখার জন্য তৈরি প্রথম অক্ষর তালিকা

এর পর ১৯৮৪ সালের দিকে তিনি কোম্পানির হয়ে লন্ডন যান। উনার অফিসের ইনচার্জ এর থেকে একটি নতুন বাজারজাত করা ম্যাকিনটশ কম্পিউটার বাসায় নিয়ে এসে শুরু করলেন বাংলার জন্য কাজ। কম্পিউটারের মেমরি ছিল মাত্র

৬৪ কিলো-বাইট রম এবং ১২৮ কিলো-বাইট র‍্যাম, কোন হার্ড-ডিস্ক ছিল না। ছোট ৯ ইঞ্চি স্ক্রিনে লেখা শুধু সাদা-কালোতে দেখা যেত।

চিত্র-২: যে মডেলের ম্যাকিনটশ কম্পিউটারে শহীদলিপির জন্ম

ম্যাকের অপারেটিং সিসটেম ছিল দু'টি ফাইলে- একটির নাম 'সিস্টেম' এবং অপরটি ছিল 'ফাইন্ডার'। উনার কাজের জন্য অ্যাপল এর সাথে যোগাযোগ এর পর তারা একটি টুল পাঠাল যে টুলের সাহায্যে তিনি সিস্টেম ফাইলের মধ্যে কি কি আছে তার কিছুটা দেখতে সক্ষম হলেন। এর মধ্যে 'ফন্ট এডিট' নামে এর একটা ফাইল ছিল যার সাহায্যে সিসটেমের সাথে যুক্ত ফন্ট গুলির আকার পরিবর্তন করা যাচ্ছিল। মেনুর উপরের লাইনের সর্ব বায়ে ছিল একটি ছোট অ্যাপেল ফলের প্রতীক। অনেকটা খেলার ছলে অ্যাপেলের ছবিটির জায়গায় বাংলাদেশের ছোট একটি ম্যাপ বানালেন ফন্ট এডিটরের সাহায্যে। সিসটেম ফাইলটা সেইভ করলেন আগের ফাইলের স্থানে। তারপর যখন আবার কম্পিউটার চালু করলেন তখন দেখলেন- অ্যাপেলের প্রতীকের জায়গায় জ্বলজ্বল করছে আমাদের প্রিয় বাংলাদেশের ছোট মানচিত্রটি।

এবার তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে কাজে লাগলেন। ইংরেজির কিবোর্ড লেআউট অনুসরণ করে বাংলা অক্ষর বসাতে লাগলেন। সাইফ স্যার কখনোই চাইতেন না যন্ত্রের/টাইপরাইটার বা প্রেস এর সীমাবদ্ধতার কারণে বাংলা বিকৃত হোক। তাই উনার শহীদলিপিতে চেষ্টা করলেন যতটা সম্ভব সব অক্ষর ও যুক্তাক্ষর অবিকৃত রাখতে। এক অক্ষরের উপর এক বা একাধিক অক্ষর চাপাবার (সুপার ইমপোজিশন) ব্যবস্থা করতে পারার ফলে উনি মাত্র ২০০ অক্ষর দ্বারা ১২০০ যুক্তাক্ষর লেখতে সক্ষম হয়েছেন। কি-বোর্ডের মাত্র ৫০টি কি দ্বারা এই ২০০ অক্ষরকে প্রকাশ করতে পারত শহীদলিপি সফ্‌টওয়্যার।

চিত্র-৩: কম্পিউটারে প্রথম অঙ্কিত বাংলাদেশের মানচিত্র

ম্যাকিনটশ কম্পিউটার উপযোগী ও প্রথম বাংলা সফ্‌টওয়্যার শহীদলিপিতে প্রকৌশলী সাইফ তিনটি সাইজের বাংলা ফন্ট সম্পূর্ণ করলেন ও নাম দিলেন যশোর, ঢাকা ও চট্টগ্রাম। লন্ডন নামের একটি ইংলিশ ফন্টও রাখলেন, যাতে প্রয়োজনে ব্যবহার করা যায়। উনি শুধু টাইপিং সফ্‌টওয়্যার করেননি। বিশ্বে প্রথম বারের মতো সম্পূর্ণ ম্যাকিনটশ কম্পিউটার এর ভাষাই বাংলা করে ফেলেন। এমনকি অ্যাপল এর লোগোটাও

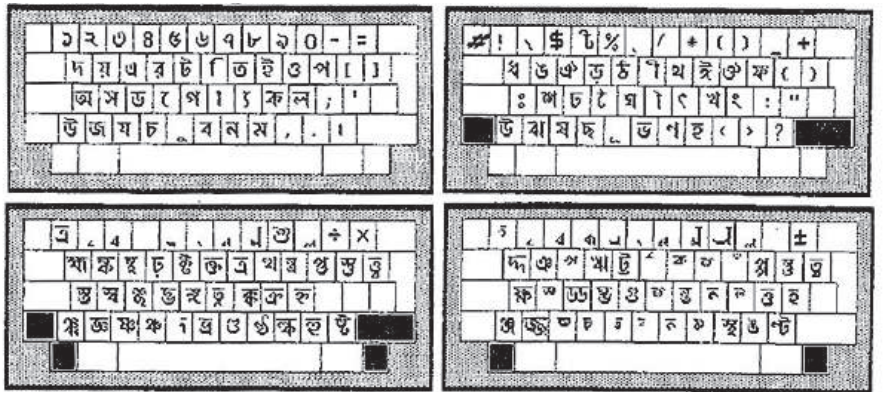

চিত্র ৪: সাইফুদ্দাহার শহীদ এর তৈরী প্রথম বাংলা টাইপিং সফ্‌টওয়্যারের কিবোর্ড লেআউট

বাংলাদেশের পতাকা বসিয়ে সাহসের সাথে উনার কাজ অ্যাপল হেডকে জানান। তারা তাকে বিপুল উৎসাহ ও প্রয়োজনীয় টুল সরবরাহ করেন। আশ্চর্য হয় যে একজন মাত্র ব্যক্তি সম্পূর্ণ একটি সিস্টেমকে বাংলাকরণ করে ফেলেছেন। ম্যাক অপারেটিং সিসটেমের ফাইলগুলি খুঁজে খুঁজে বিভিন্ন মেনু আইটেমের ইংরেজি নামগুলি বদলিয়ে বাংলা নাম বসালেন। ফাইল, এডিট, ফাইন্ড, ফরম্যাট, ফন্ট, টাইপ -এর বদলে নথি, সম্পাদনা, অনুসন্ধান, কাঠামো, বর্ণমালা ও ধরন লিখলেন। কাট, কপি ও পেস্ট -এর স্থলে কর্তন, প্রতিলিপি ও সংযোজন।

শেষ পর্যন্ত প্রথম শহীদলিপি তৈরী হয়ে গেল। ঠিক করলেন মাকে প্রথমে একটা চিঠি লিখে এটার যাত্রা শুরু করবেন। উনি লিখেছেন: "দিনটি ছিল ২৫শে জানুয়ারি, ১৯৮৫ - দিনটি মনে রাখার বিশেষ কারণ হচ্ছে, কাকতালীয় ভাবে ঐ দিনটি জন্মদিনও ছিল। চিঠিটা অ্যাপেলের ডট-মেট্রিক্স প্রিন্টারে প্রিন্ট করে সেদিনই ডাকে পাঠালাম মাকে।"

তালাবন্ধ	Locked
দশমিক অবস্থান	Decimal tab
দশমিক অবস্থান নির্দেশক	Decimal tab marker
দু'বার চাপ	Double click
ধরন	Style
নথি	File
নথিমালা	Folder
নির্দেশক	Cursor, marker
নির্দেশ বাতায়ন	Dialogue box
নিবন্ধ	Document
নিবন্ধ বাতায়ন	Document window
নির্বাচন	Select, selection
নির্বাহী	System finder programme
নোট বই	Note book
পদাংশ	Footer
পর্দা মণ্ডল	Desk top, Screen
পিছন-কী	Backspace key, delete key
প্যারা নির্দেশক	Indentation marker
প্রবেশ-কী	Enter key
প্রবেশ বিন্দু	Insertion point
ফেরত-কী	Return key

চিত্র-৫: ইংরেজির বদলে বাংলা ভাষায় পূর্ণাঙ্গ কম্পিউটার এর জন্য শব্দ তালিকা

স্থানীয় ম্যাক ব্যবহারকারীদের একটা কমিউনিটি ছিল যেখানে তারা মডেমের মাধ্যমে নানা টুল একজন আরেকজনকে আদানপ্রদান করত। কিন্তু উনার কাছে তখন মডেম কিনার মত টাকা ছিল না। তখনকার ৩০-৪০ পাউন্ডের মত একটি মডেম এর মূল্য যা উনি উনার শহীদলিপি সফ্‌টওয়্যার বিক্রি করে জোগাড় করতে পারবেন ভেবে শহীদলিপি কিনবে কিনা জানতে বিবিসি অফিসে কল করলেন। তারা বিপুল উৎসাহে উনাকে তাদের হেড অফিসে ডাকলো। উনার জন্য সকল ব্যবস্থা করে রাখলো। উনিও সফ্‌টওয়্যারের একটি কপি ফ্লপি ডিস্কে করে নিয়ে গেলেন। ম্যাক চালু হচ্ছে

দেশের পতাকায় দেখে তাদের উৎসাহ হাজারগুণ বেড়ে গেল। উনার প্রশংসায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন বিবিসির সকলে। একটি সাক্ষাৎকার নিলেন তাঁরা। আরো নানান অনুষ্ঠানে তাঁর এই কাজের কথা প্রচারিত হতে থাকলো। একজন গুজরাটি ব্যবসায়ী গুজরাটি ভাষার জন্য উনাকে কাজ করার অফার করলো। পরবর্তীতে উনি করলেনও। অর্থাৎ তিনি বাংলা ও গুজরাটি প্রথম টাইপিং সফ্টওয়্যার, কিবোর্ড লেআউট, ও ফন্ট এর জনক। লন্ডনের বাংলাদেশ দূতাবাসেও অনুষ্ঠান হলো। পরে নানান জায়গা থেকে উনার শহীদলিপির চাহিদা দেখে উনি শহীদলিপি ব্যবহার করেই ব্যবহার এর জন্য ম্যানুয়াল লিখলেন ও ৫০ কপি ছাপালেন। সেটাই ছিল ডিজিটাল পদ্ধতিতে করা প্রথম বাংলা বই। শহীদলিপির ম্যানুয়াল দেখতে পারো উনার ব্লগ এর এই লিঙ্ক থেকে-
https://sites.google.com/site/shahidlipi/Home/introduction-1

তখন ছিল IBM আর অ্যাপল এর কম্পিউটার এর রাজত্ব। তখনও উইন্ডোজ আসেনি। শহীদলিপি ছিল অ্যাপল এর জন্য। প্রকৌশলী সাইফ দেশে ফিরেন। এবার উনি শহীদলিপি অনুসরণ করে সকল প্রকার ব্যবহার উপযোগী ট্রু টাইপ ফন্ট ttf (আজও এই ttf চলে, এবং এটিই ফন্ট ফাইল এর ফরমেট.ttf) তৈরির ডিজাইন এর কাজে আর্ট কলেজের শিল্পীকে লাগিয়ে দিলেন। শিখিয়ে দিলেন কিভাবে কি করতে হবে। তা থেকে নিজেই করলেন যেকোনো ডিভাইসে ব্যবহার উপযোগী প্রথম বাংলা ttf।

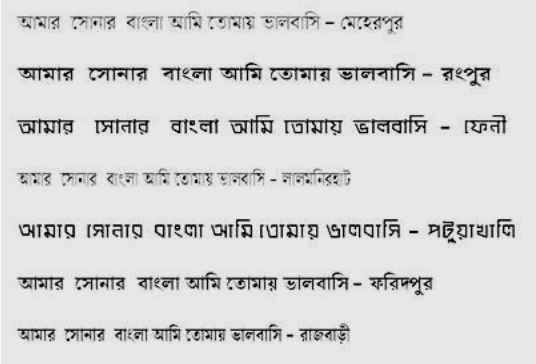

চিত্র-৬: উনার করা কিছু ফন্ট এর সেম্পল। যা আজও ব্যবহার সম্ভব

তবে ttf গুলো ছিল ASCII/ANSI ধরনের। এই পদ্ধদিতে অন্য ভাষার ইউনিকোড ব্যবহার করে বাংলা লিখা হত (জনপ্রিয় বিজয়ও এই পদ্ধতির)। পরবর্তীতে ইউনিকোড সোসাইটি বাংলার জন্য আলাদা ইউনিকোড ব্লক নির্ধারণ করে। ইউনিকোড বাংলা ফন্টও তৈরি হয়। দেশে উনি অ্যাপল এর ডিলার হন ও উনার ফন্ট ব্যবহার করে ডেস্কটপ পাবলিশিং খুলেন। সেখান থেকে কবি নির্মলেন্দু গুণ, বিখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা কাদের সিদ্দিকী এর মত লেখক বই ছাপাতেন। উনি শুধু নিজেই করে শান্ত ছিলেন না। অনেক ছাত্রকে শিখিয়ে গিয়েছিলেন দারুণ সৃজনশীল ও বুদ্ধিবৃত্তিক কাজগুলো। একটি এডুকেশন সেন্টারও গড়েছিলেন। বুয়েট এর সিলেবাস পরিবর্তন করে যুগোপযোগী করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। উনার দোকানের অনুরূপ অনেক দোকান সারা দেশে আস্তে আস্তে গড়ে উঠলো।

শিক্ষক সাইফ এর পর এই কাজে হাত লাগান তাঁর ছাত্র (বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী) মোস্তফা জব্বার। ১৯৮৮ সালের ১৬ ডিসেম্বর কম্পিউটারে বাংলা লেখালেখির জন্য প্রথমবারের মতো বিজয় ব্যবহার করা হয়। বিজয়ও একই রকম ASCII/ANSI ধরনের লিখন পদ্ধতি, যেখানে ইংরেজি ও অন্যান্য কিছু বর্ণমালার ইউনিকোড

ব্যবহার করে বাংলায় লিখা হয়। অর্থাৎ, যদি বিজয় দিয়ে কেউ আমার সোনার বাংলা লিখতে চায় তবে তা মূলত "আমার সোনার বাংলা।" এরকম দেখাবে সকল ডিভাইসে। যতক্ষণ ওই ডিভাইসে বিজয় ইনস্টল করা না হয় ততক্ষণ তা ইংরেজি ও চিহ্ন এর মত দেখায় আর বিজয় ইনস্টল করে বিজয় এর ফন্টগুলো (ফন্ট-লিপি, অক্ষর এর আকৃতি যা ttf ফাইল হয়) থেকে যেকোনো ফন্ট বাছাই করলে "আমার সোনার বাংলা" অর্থাৎ বাংলায় দেখা যাবে। যাত্রার শুরু থেকেই ব্যাপক জনপ্রিয় হয় আনন্দ কম্পিউটার এর বিজয় সফ্টওয়্যার। তাদের জনপ্রিয় ফন্ট SutonnyMJ সকল ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত। পাঠ্যবই তে তাদেরই Sabrena TonnyMJ ফন্ট ব্যবহার হয়।

চিত্র-৭: সাইফুদ্দাহার শহীদ

চিত্র-৮: বামে বিজয় ও তাদের ফন্ট সুতন্বী ও ডানে অভ্র সাথে সিয়াম রূপালী ফন্ট

এর পর আসে সবচেয়ে জনপ্রিয় ও সহজ বাংলা সফ্টওয়্যার "অভ্র"। অভ্র ছিলো উন্মুক্ত, যে কেউ তা ব্যবহার করতে পারবে বিনামূল্যে, যা আগে কেউ করেনি। ২০০৩ সালের ২৬ মার্চ মেহদী হাসান খান নামের এক সৃষ্টিশীল মেডিক্যাল শিক্ষার্থীর হাতে তৈরি হয় এটি। এটি বহুল জনপ্রিয় হবার কারণ হচ্ছে উন্মুক্ত আর ইউনিকোড সমর্থিত। অর্থাৎ এখানে আগের গুলোর মত ইংরেজি বর্ণের উপর ভিত্তি না করে বাংলা ইউনিকোড এ সরাসরি ব্যবহার করা যায়। অভ্র কিবোর্ড এ "ami" লিখার সাথে সাথে তা বদলে "আমি" হয়ে যায়। অর্থাৎ সাধারণ কিবোর্ড দিয়ে বাংলা লিখা যায়। অভ্র ও তাদের Solaiman Lipi সহ সকল টুল পাওয়া যায় https://www.omicronlab.com/bangla-fonts.html ঠিকানায়।

এর পর আকর্ষণীয় ডিজাইনের ইউনিকোড বাংলা ফন্ট নিয়ে সামনে আসে আল মামুন হোসেন এর Ekhushey। উনার সকল ফন্ট ইউনিকোড সমর্থিত। উন্মুক্ত কাজ হওয়ায় ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয় এবং এখনও তা অব্যাহত আছে। উনার ফন্টগুলো দেখে আসতে পারো https://ekushey.org/ ওয়েবসাইট থেকে।

পাশাপাশি তিনি শিক্ষকের ভূমিকাও পালন করেন ইউটিউব চ্যানেল এ কিভাবে বাংলা ফন্ট ডিজাইন থেকে কোডিং করতে হবে সব বিস্তারিত শিখিয়ে। উনার মাধ্যমে অনেকেই বাংলা ফন্ট এর কাজ শিখেছে এবং শিখছে। সহজে উনার সাইট থেকে এবং মুক্ত প্লাটফর্ম

https://okkhor52.com/designer.html?id=_002 থেকে উনার ফন্টগুলো ডাউনলোড ও বিনামূল্যে ব্যবহার করা যাবে। জানলে অবাক হবে যে ব্যাপন এর লোগো Ekushey Belycon ফন্ট দিয়ে করা। আর নিচের ট্যাগলাইন এ ব্যবহৃত ফন্ট হচ্ছে Ekushey Puja।

এই ধারায় ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ছাত্র তৌহিদুল ইসলাম হিমেল নিয়ে আসেন বেঙ্গল ফন্ট সফ্টওয়্যার। সময়ব্যাপী গবেষণা করে করে একেকটি ফন্ট তৈরি করেন তারা। তবে বেঙ্গল ফন্ট এর ফন্টগুলো ব্যবহার করতে অবশ্যই তাদের সফ্টওয়্যার ইনস্টল করতে হবে এবং নির্দিষ্ট কিছু বাদে বাকিগুলো ব্যবহারে মাসিক মূল্য পরিশোধ করতে হয়। অন্য সকলের মত উনাদের ফন্ট এর ttf ফাইল উনারা উন্মুক্ত করেন নি। তবুও বাংলার জন্য নান্দনিক সব ফন্ট নিয়মিত উদ্ভাবন করছেন তাঁরা। এ বছর এর ২১ ফেব্রুয়ারিতে যুক্ত করেন দীঘলবর্ণ নামের একটি ফন্ট। এ পর্যন্ত তাদের ফন্ট সংখ্যা ১২টি। তাদের https://bengalfonts.com/ সাইটে পাওয়া যায় তাদের উইন্ডোজ ও ম্যাক ব্যবহার উপযোগী সফ্টওয়্যার

সবশেষে থাকছে সবচেয়ে বড় বাংলা টাইপ ফাউন্ড্রি এর পরিচিতি। আজকাল সকল ব্যানার, ফেস্টুন, ফেসবুক এর বাংলা বিজ্ঞাপন বা টিভি অনুষ্ঠান এর বিজ্ঞাপন এ যাদের ফন্ট সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ও সকল ডিজাইনার এর প্রিয় ফন্ট এর উৎস হচ্ছে https://lipighor.com। তাদের ফন্টগুলো একই সাথে রেগুলার ও ইতালিক (বাঁকা) স্টাইলে এবং ইউনিকোড ও ANSI ধরনে পাওয়া যায়। অর্থাৎ যে কোনো সফ্টওয়্যার দিয়ে করে তাদের নান্দনিক ফন্ট ব্যবহার করা সম্ভব। আবার অনেক ফন্ট এ মাল্টি ওয়েট-ও দেওয়া হয়। ২০২১ এর ফেব্রুয়ারি তে তাঁরা ৫ ভাষা শহীদ এর নামে ৫ টি আলাদা আলাদা ফন্ট এনেছেন এবং ২১ তারিখ রিলিজ করেছেন সবুজ ৫২ নামের ফন্ট। সম্পূর্ণ ফ্রি এই ফন্টগুলো ব্যবহার করা যাবে মোবাইল, পিসি বা যেকোনো উপায়ে। এছাড়াও গুগল প্লে স্টোরে আছে তাদের অ্যাপ LIPIGHOR যা দিয়ে সহজেই বাংলা ফন্টের স্বাদ নেওয়া যায়। এ পর্যন্ত তাদের ৪৯ টি ফন্ট ওয়েবসাইটে দিয়েছেন আর তার মধ্যকার ৪৪ টাই ফ্রি। প্রিমিয়াম গুলোর মূল্য ১০০ টাকা।

চিত্র-৯: বেঙ্গল ফন্টস এর সবগুলো ফন্ট

তাদের ফন্ট এর আকর্ষণ হচ্ছে এই মাত্রালতা। ফ্রি প্রিমিয়াম সকল ফন্ট থাকে মাত্রালতা ও অন্যান্য ফিচার যেমন, বাংলা চিহ্ন। বাংলার পাশাপাশি তাঁরা অসমীয়া ভাষার অক্ষরও সংযুক্ত করে দিচ্ছেন তাঁদের ফন্টে। ফলে এপার বাংলা ওপার বাংলা সবাই সহজে তাদের ফন্ট ব্যবহার করতে পারে। শুধু টিমের ডিজাইনার না, যেকোনো ডিজাইনার তার ডিজাইন জমা দিলে তা লিপিঘর টিম ফন্ট আকারে সাইটে পাবলিশ হয় ও প্রতি ফ্রি ফন্ট এর জন্য ডিজাইনারকে

সম্মানীও প্রদান করা হয়। যেন এই খাতে লোকের আগ্রহ তৈরি হয়। শুনলে অবাক হবে যে লিপিঘর এর সহ প্রতিষ্ঠাতা নুরুল আলম আদর বর্তমানে একাদশ শ্রেণীর একজন ছাত্র ও একই সাথে ফন্ট ডিজাইনার, ডেভেলপার ও সাইট ক্রিয়েটার। যে বয়সে আমরা বসে গেইম খেলছি তখন সে নিরলস ভাষার জন্য কাজ করছে। তোমাদের যদি কারো ইচ্ছে করে প্রথম দিকে বর্ণিত পুরাতন হ্যালহেড এর আদলে বাংলা লিখতে তবে তা করতে পারবে। লিপিঘর পুরাতন কাজগুলো উদ্ধার করে সেই ডিজাইনে ব্যবহার উপযুক্ত ফ্রি ফন্ট রিলিজ করেছে তাদের সাইটে। যা এই লিঙ্কে পাবে- www.lipighor.com/NiladriHalhed.html

চিত্র-১০: লিপিঘর এর প্রিমিয়াম ফন্ট পৃথু এর ডিজাইন ও মাত্রালতা

লিপিঘর এর আরেকটি প্রজেক্ট www.okkhor52.com হচ্ছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ফ্রি ও উন্মোক্ত ফন্ট এর কালেকশন। ওখান থেকে পাওয়া যাবে নানান ফাউন্ড্রি এর নানান ডিজাইনার এর হরেক রকমের ফন্ট। যেনো বাংলা লিপির মেলা। নানান উৎস থেকে এক করে এনে সকলের ব্যবহার এর উপযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে এই সাইটে।

চিত্র-১১: এক পলকে লিপিঘর এর নানান ডিজাইন এর ফন্ট

একটি বাংলা ফন্ট বানানো অনেক সময়ের ব্যাপার ও কষ্টসাধ্য। ইংরেজি ভাষার কোটি কোটি ফন্ট আছে। আর বাংলায় সব মিলিয়ে এক হাজার হয় কিনা সন্দেহ। ইংরেজি অক্ষর সংখ্যা কম। কিন্তু বাংলায় ৫০ টি অক্ষর এর সাথে প্রায় ৩০০+ যুক্তাক্ষর। আছে আরো নানান চিহ্ন ও প্রতীক। একটা একটা করে অক্ষর আঁকতে হয়। প্রতিটা অক্ষর এর হাফ ফরম আঁকতে হয়। প্রতিটা যুক্তবর্ণ আঁকতে হয়। আঁকতে হয় ভেক্টর ফরম্যাটে। সাধারণত আমরা যেসকল ছবি দেখি তা হচ্ছে পিক্সেল ফরম্যাট। অতিরিক্ত জুম করলে ঝাপসা হয়ে যায়। কিন্তু ভেক্টর আকারে আঁকলে যতই জুম করা হোক তা ঘোলাটে হবে না। আঁকার পর সবগুলো সমান আকারের করতে হয়। নানান পেইড সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে দিনের পর দিন মাসের পর মাস

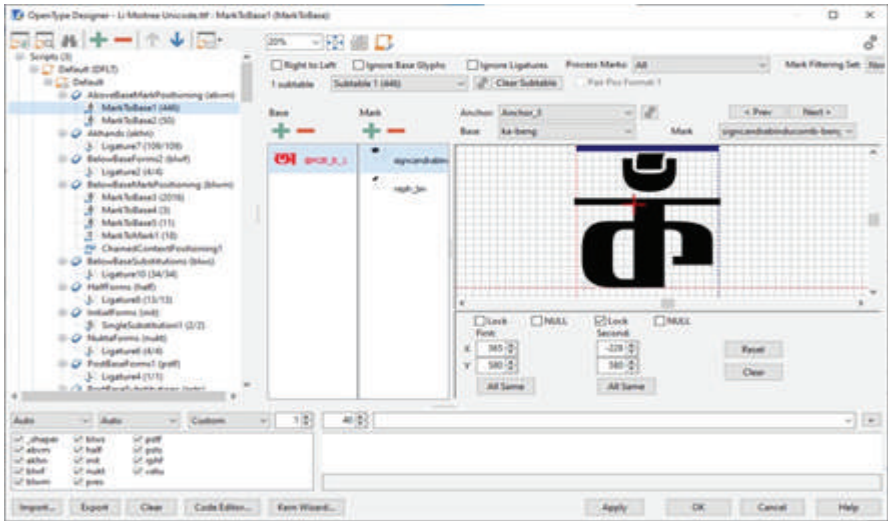

চিত্র-১২: একটি ফন্ট এর কাজ চলাকালীন স্ন্যাপশট

ইউনিকোড অনুসারে তা বসাতে হয়। জটিল সব কোডিং করতে হয়। একটা পূর্ণাঙ্গ ফন্ট করতে দক্ষ একজনের প্রায় ৪৫ দিনের বেশি লাগে। তারপর আসে পরীক্ষণ। কোনো ত্রুটি থাকল কিনা। তারপর ভাষার জন্য নিবেদিতপ্রাণ এইসব লোকেরা ttf ফাইল ফ্রি করে দেন। সবাই যে ফ্রি দেয় এমন না। অনেকে প্রিমিয়াম রাখে। এত কষ্টের পরেও কি তারা সামান্য পারিশ্রমিক দাবি করতে পারে না??

বাংলাকে আধুনিক ভাবে যারা ব্যবহার উপযোগী করছেন তারা এখনো অনেকটা আড়ালেই থেকে গেলেন। আমাদের উচিত তাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকা। তাদের কথা, তাদের পরিচয় প্রকাশ ও প্রচার করা।

তথ্য সূত্র/উৎস:

১. *sites.google.com/site/banglaswapon/sahidalipira-itihasa*
২. *cadetcollegeblog.com/user/saif-shahid*
৩. *cadetcollegeblog.com/*
৪. *m.somewhereinblog.net/mobile/blog/nishkorma_roy/29213193*
৫. *www.sachalayatan.com/*
৬. *bsbk.portal.gov.bd/apps/bangla-converter/index.html*
৭. *www.omicronlab.com/blog/*
৮. *saif_shahid@yahoo.com*
৯. *www.facebook.com/NurulAlomAdor*
১০. *www.facebook.com/lioighor*
১১. *www.prothomalo.com/feature/shapno/Kviv-‰Zwi-K‡ib-GB-my›`i-evsjv-d›U*

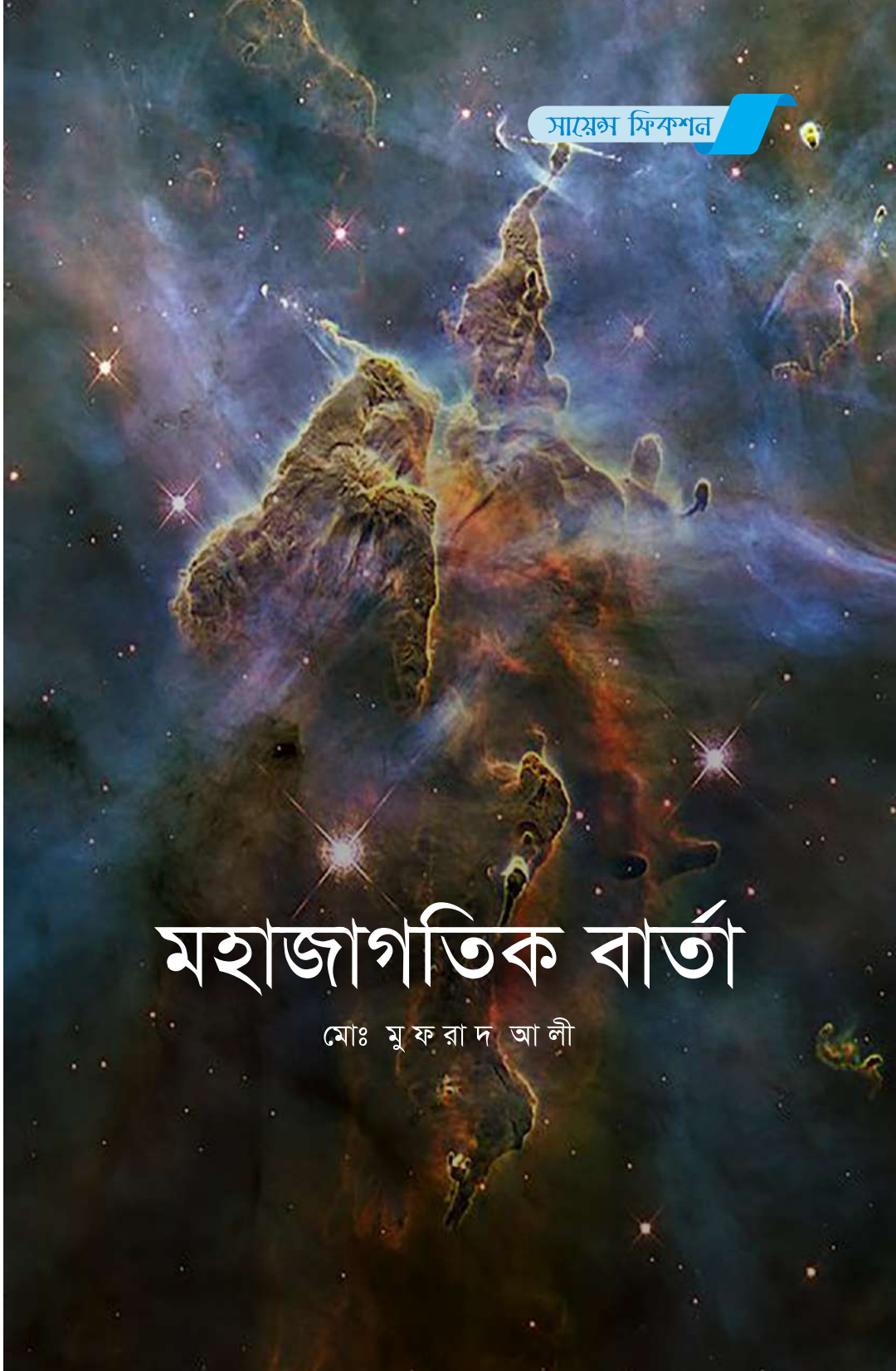

-কিরে ক্যাম্পাস খোলা না আজ তোর? ফোন বাজে শুনিস না? রাব্বি ফোন দিচ্ছে, দেখ!
সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বই থেকে মুখ তুলে নীলার দিকে তাকালাম আমি। সকালের নাস্তা খাওয়ার জন্য কয়েকবার ডেকে সাড়া না পেয়ে নাস্তার প্লেট নিয়ে রুমে এসে পড়েছে সে।
-রাব্বি তোকে তিন তিনবার ফোন দিয়েছে দেখ। কোন জরুরি প্রয়োজনেও তো হতে পারে। কথা বলে দেখবি তো নাকি!
-কি আর বলবে? জবের প্রস্তুতি নিচ্ছে তো। সবচেয়ে কঠিন কঠিন টপিক গুলো আমাকে দিয়ে সলভ করতে বলবে।
-তা করে দিলে সমস্যা কি? তোকেও তো একটা চাকরি করতে হবে নাকি? সলভ করে দিলে তোরও কিছু জানা হয়ে গেলো, রাব্বিরও উপকার হলো। আর এভাবে ঘরের মধ্যে চুপচাপ কি করিস? কত বার মা ডাকলো তো নাস্তা দিয়ে....
-আপু, একটা কাজ হয়ে গেছে। কাউকে বলবি না, বল?
-ঘরের কিছু একটা নষ্ট করেছিস তাতো তোর চেহারা দেখেই আন্দাজ করা যায়। কি হয়েছে বলতে পারিস। কাউকে বলবো না।
-বলবি না তো? বিশেষ করে আব্বু যেন না জানতে পারে।
-আচ্ছা জানবে না বল।
-আব্বুর কিনে দেওয়া নতুন ম্যাকবুকের মাইক্রোফোনটা কাজ করতেছে না কেন জানি।
-এমনি এমনি কাজ করবে না তা কি করে হয়। নিশ্চয় তুই কিছু একটা করেছিস!
-সত্যি করে বল আব্বুকে বলবি না?
-আচ্ছা পরিষ্কার করে বল। বলবো না যা..
-রাতে খুলেছিলাম সব।
-খুলে নিশ্চয় ম্যাকারি করেছিস।
-হুম রে...
-কি করেছিস বল।
-ঐযে মাইক্রফোনটা পিসিবি থেকে খুলেছিলাম।
-তারপর?
-তারপর আমার তৈরী করা মাল্টি স্টেজ এমপ্লিফায়ারের সাথে লাগেয়েছিলাম। দেখলাম কাজ করে কিনা।
-কি কাজের জন্য?
-মানুষের শ্রবণসীমার ঊর্ধ্বের শব্দ গুলো শোনার জন্য।
কথাটা বলেই আপুর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সামনে রাখার বইয়ের দিকে মনোযোগ দিলাম। নীলা যে চোখ বড় বড় করে আমার দিকে মুখ হা করে চেয়ে আছে বুঝতে পারতেছি আমি। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য নিজের থেকেই বললাম...
-কিন্তু কাজ করে না রে.... মিছেমিছে রাত জেগে কয়েকদিন ধরে এসব গাধা খাটুনি খাটলাম। লস প্রজেক্ট.....স্বাদের ম্যাকবুকের মাইক্রোফোনটা নষ্ট করলাম।
-তা তুই এইটা ব্যবহার করতে গেলি কেন? বাজার থেকে একটা মাইক্রোফোন কিনে আনতে পারতি...
-তুই হয়তো জানিস না এইটাতে নয়েজ ফিল্টারের সর্বশেষ প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে এবং গেইন কন্ট্রোলের জন্য আমার তৈরী করা এমপ্লিফায়ারের সাথে ভালো কাজ করবে বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু কাজ হলো না রে....

-সমস্যা কোথায় হয়েছে কিছু আন্দাজ করেছিস? (আপুর আগ্রহ)
-হুম। তবে এখন বলা যাবে না। পরে এক সময় বলবো। আমার বিশ্বাস আছে ভালো কিছু একটা হবে ইনশাআল্লাহ।
-আমাকে বলতে পারিস, আমি যদি হেল্প করতে পারি কিছু।
আমি কিছু বলতে যাবো এমন সময় আম্মুর ডাকাডাকি।
-কিছু প্রোগ্রাম লিখে দিতে হবে। কোড ট্রান্সলেট করার জন্য। সময় হলে আমি তোকে বলবো। কম্পিউটার সায়েন্সের ছাত্রী তুই, পারবি জানি।
-আচ্ছা চেষ্টা করবো। জানাস আমায়। তোর এ যন্ত্র আবিষ্কারের যদি একটু অবদান রাখতে পারি অবশ্যই ভালো লাগবে আমার। ও আরেকটা কথা। দাদুর তো দুইটা হিয়ারিং এইড। একটা ভেঙে গেছে। শো-কেসের ড্রয়ারে আছে। দাদু পরে না ঐটা। এনে রাখতে পারিস। ম্যাক বুকের আর কিছু খুলিস না। পারলে মাইক্রোফোনটা আবার লাগিয়ে দিতে পারিস যদি ঠিকঠাক কাজ করে। কিছু করার আগে আমাকে জানাস, কোন অঘটন যেন না ঘটে তাহলে কিন্ত তোর সাথে আমিও বিপদে পড়বো। আচ্ছা যাই .... মা ডাকে..... আসি মা...
নীলা চলে গেল। পিছে পিছে আমিও গেলাম। দাদু জানালার পাশে কি যেন পড়তেছিলো। বই-টই কিছু একটা হবে। বয়স আশি পার হলেও এখনও খালি চোখে সব পড়তে পারেন, তবে কানে একটু কম শুনতেন। আব্বুর কিনে দেওয়া হেয়ারিং এইড কানে লাগিয়ে এখন সে সমস্যাটাও কম, মোটামুটি ভালই শোনেন এখন। দাদুর শো-কেসের ড্রয়ার খুলে দেখি হ্যাঁ হেয়ারিং এইড জায়গা মতোই আছে। শুধু পিছনের দিকে টেইলটা একটু ভাঙার মতো হয়ে গেছে। পকেটে পুরে ড্রয়ার লাগিয়ে আমার রুমে চলে আসলাম। ব্যাগ থেকে ম্যাক বুকের মাইক্রোফোনটা, মাল্টি স্ট্যাজ এমপ্লিফায়ার, আর হেয়ারিং এইডটা পাশাপাশি রাখলাম। নীলা আপু জানে না যে গতকাল ক্যাম্পাসে গিয়ে ল্যাব সহকারী আরিফিন ভাইকে বলে মাইক্রোফোনের গ্র্যানুয়েলের কার্বনগুঁড়ো বিশেষ পদার্থ দিয়ে ডোপিং করে এনেছি। আরিফিন ভাই বলেছেন এতে নাকি অনেক বেশি কম্পাঙ্কের তরঙ্গও এটা ডিটেক্ট করতে পারবে এখন।
রাত ১০টা। ৩টা ডিভাইস আবার পাশাপাশি রাখলাম ব্যাগ থেকে বের করে। অ্যাসেম্বল করলে কাজ করবে তো। মাইক্রোফোন সাউন্ড ডিটেক্ট করবে, এমপ্লিফায়ার গেইন কনট্রোল করবে আর হেয়ারিং এইডের স্পিকার থেকে তা শুনতে পাবো। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম যন্ত্রগুলোর দিকে আরও বেটার কোন আইডিয়া যদি পেয়ে যাই! তবে হারমনিক্স ডিসটরশনগুলো দেখার জন্য এমপ্লিফায়ার স্ট্যাজে একটা ছোট মনিটর থাকলে ভালো হতো।
আর সময় নষ্ট না করে অ্যাসেম্বল করতে শুরু করলাম। হার্ট বিট বেড়ে গেছে। কাঁপাকাঁপি হাতে সোল্ডারিং করছি। হাতে গ্লাভস আর চোখে চশমা পরে নিয়েছি যেন পাছে কোন দূর্ঘটনা না ঘটে! মাইক্রোফোনের সাথে এমপ্লিফায়ার সোল্ডারিং শেষ। এবার হেয়ারিং এইড বাকি। রজন আর পারদ নিয়ে লাগানোর সাথে সাথে হেয়ারিং এইডের এলইডিটা টিপটিপ করে জ্বলা শুরু করলো। আর স্পিকার দিয়ে চিচি শব্দ বের হচ্ছে। অ্যামপ্লিফায়ারের বিশেষ বাটন দিয়ে গেইন কমিয়ে দিলাম। শব্দ কমে গেছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম নতুন কিছু ঘটে কিনা দেখার জন্য। ৪-৫ মিনিট অপেক্ষা করলাম। গেইন কম বেশি করে কনফার্ম হলাম যে তা নিখুঁত ভাবে কাজ করছে। গেইন কমে দিয়ে স্পিকারের কাছে গিয়ে কান লাগিয়ে শোনার চেষ্টা করলাম। ছোটবেলা কিছু কিছু ব্যান্ডে যেরকম অনেক গুলো চ্যানেল এক সাথে টিউন করলে নয়েজ হয় ঠিক সেরকম শুনাচ্ছে। চোখে মুখে আমার আবিষ্কারের খুশি। আলহামদুলিল্লাহ। যন্ত্রটা কাজ করছে ঠিকঠাক মতো!!!!

সোল্ডারিং এর লাইন খুলে দিয়ে পাশে রাখলাম। পুরো যন্ত্রটা একটা কাগজের বোর্ডর উপর রাখলাম। টিউন করা ফ্রিকুয়েনসি গুলো দেখার জন্য যদি কোন একটা মনিটর বা ছোটখাটো এলইডি ডিসপ্লে থাকতো হয়তো আরও কিছু আন্দাজ করা যেতো। আপুর কাছে মনে হয় ডিকোডার বা অসিলোস্কোপের মতো কিছু থাকতে পারে যেটা দিয়ে ফ্রিকুয়েন্সির ধরন সহজে দেখা যেতো। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি এরই মধ্যে রাত ১২টা বেজে গেছে। আপুকে জাগানো কি ঠিক হবে?

ফোনটা হাতে নিয়ে আপুকে ফোন দিলাম। দুইবার বিপ হওয়ার পরেই ওপাশ থেকে ভেসে আসলো..

-কি রে কিছু বলবি।

-ঘুমাচ্ছিস না?

- কি বলবি তাড়াতাড়ি বলে ফেল।

-আমার রুমে একটু আসবি?

ফোন কেটে দিয়েছে আপু। সম্ভবত আসতেছে।

ফ্লাস্ক থেকে এক মগ কফি ঢাললাম মগে। এক চুমুক দিতেই আপু এসে হাজির রুমে।

-কি রে কি হয়েছে বল।

হাই তুলতে তুলতে আপু বললো।

-একটু বস বেডে, বলার জন্যই তো ডেকেছি।

কফিতে চুমুক দিয়ে আপুর দিকে তাকাতেই দেখি আমার টেবিলের দিকে সে চেয়ে আছে।

-সব কি অ্যাসেম্বল করেছিস নাকি?

-হুম। কাজ করছে মোটামুটি। স্পিকারের কাছে কান লাগিয়ে দেক....

বলেই মগে একটা চুমুক দিলাম।

আপু অনেকক্ষণ কান লাগিয়ে শুনলো।

-ঠিক আছে বুঝলাম হাই ফ্রিকুয়েন্সি এটা টিউন করতে পারছে। কিন্তু এগুলোকে আলাদা করে টিউন করে তা রিড করা কি সম্ভব?

-আপু, তুমি কি আমাকে একটা ডিকোডার বা ট্রান্সলেটর এর প্রোগ্রাম করে দিতে পারবে যেটা দিয়ে বিভিন্ন রেঞ্জের ফ্রিকুয়েন্সিগুলো আমি ইংরেজি বর্ণমালায় রূপান্তর করতে পারবো?

-হুম আসে তো আমার কাছে। গত প্রজেক্ট-এ তো আমি এটা নিয়েই কাজ করেছি। আমার কাছেই ডিকোডারটা আছে। দাঁড়া আনছি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আপু যন্ত্রটা হাতে রুমে আসলো। টেবিলে রেখে পরিচয় করে দেওয়া শুরু করলো।

-এই যে এই এইটা হচ্ছে অনেকটা সাউন্ড ডিটেকটর বা ট্রানসডিউসারের মতো। এটা শব্দ তরঙ্গ পেলে তা সাইন ওয়েভ আকারে মনিটরে দেখাবে। এটাতে প্রোগ্রাম করা আছে কোন ধরনের সাউন্ডে তা কি কি বর্ণ এবং কি কি ওয়েভ দেখাবে। তুই চাইলে ইউএসবি লাগিয়ে প্রোগ্রাম চ্যাঞ্জ করে নিতে পারবি। আমার ঘুম পাচ্ছে। আমি গেলাম। থাক। বেশি রাত জাগিস না। ফজর কাজা হয়ে যাবে।

যন্ত্রটার সাথে পরিচয় করে দিয়ে আপু চলে গেল।

আমার কেমন জানি মনে হচ্ছে স্বপ্ন পূরণের খুব কাছাকাছি চলে এসেছি আমি। হে আল্লাহ আমার সহায় হোন!

দরজায় অনবরত ধাক্কায় ঘুম ভেঙে গেল। ঘড়িতে দেখি ৫টা বেজে ৫০ মিনিট।

-নামাজ পড়বি না? (আপুর হাঁক....)

-হুম উঠি.....

ব্রাশ করে ওজু সেরে মসজিদে গেলাম নামাজ পড়তে। নামাজ শেষে রুমে এসে দেখি আপু চেয়ারে বসা। টুপি খুলতে খুলতে আপুকে বললাম।

-আপু আমার রেডিওটা আজ রাতে খুলেছিলাম। ঐটার আইএফ ট্রান্সফর্মার, ফেরাট এন্টেনা আর টিউনিং ক্যাপাসিটর গুলো এটাতে লাগিয়েছি তুমি চলে যাওয়ার পর। এখন অনেক ভালো রেসপোন্স পাওয়া যাচ্ছে।

-সেটা না হয় বুঝলাম। কিন্তু এ আননোন ফ্রিকুয়েন্সিগুলো থেকে তুই ডাটা পাবি কিভাবে?

-আমার মনে হয় যন্ত্রটাকে কোন কিছু দিয়ে ভু-পৃষ্ঠ থেকে ৩/৪ কিলো উপরে রাখতে পারলে আরও নতুন নতুন ব্যান্ডের ফ্রিকুয়েন্সি টিউন করতে পারবো। আর মানুষ যেমন রেগে গেলে, হাসলে বা কান্না করলে যেরকম বিভিন্ন রকম শব্দ করে আমিও ঠিক সেই প্রোগ্রাম ইউজ করেই নির্দিষ্ট চ্যানেলের ফ্রিকুয়েন্সিকে তোমার ডিকোডার দিয়ে বোধগম্য করে তুলতে পারবো ইনশাআল্লাহ

-অনেক পরিশ্রম করতে হবে কিন্তু এর জন্য। বুঝতে পারতেছিস? রাব্বির ড্রোনটা ইউজ করতে পারিস। ওর ড্রোনটার রেঞ্জ মনে হয় ভালোই হবে। অনেক দামি ।

-হুম। ৬ কিমির পর্যন্ত মনে হয়। দেখি ওকে একটা ফোন দিই।

মোবাইল নিয়ে কন্টাক্ট নামবার বের করে ফোন দিতেই রিসিভ করলো

-কিরে আলী। কিছু বলবি?

-হু ম রে।

-বল।

-তোর ড্রোনটা একটু দিতে পারবি। একদিনের জন্য?

-তোকে অংক করে নেওয়ার জন্য কত ফোন দিই তুই ধরিস না। আর আজ ড্রোন চাচ্ছিস!

-আচ্ছা তোর ম্যাথ সব মেইল কর। আমি করে দিচ্ছি। আর সামনের শুক্রবারে একটু ড্রোন্টা দিস রে। বেশি না। এই ১০/১৫ মিনিট উড়াবো। তুই সঙ্গেই থাকবি। কাজ হয়ে গেলে নিয়ে যাস।

-আচ্ছা। আর আমি মেইল করতেছি চেক করিস।

-আচ্ছা। বলে ফোন কেটে দিলাম।

আপু কাজ হয়েছে। সামনের শুক্রবার ও আসবে ড্রোন নিয়ে। এর মধ্যে আমাকে একটা নির্দিষ্ট ব্যান্ডের সিগন্যাল কে ডিকোড করার প্রোগ্রাম রেডি করে দিতে হবে তোকে।

-আচ্ছা আপাতত সারাদিন ভেবে দেখ আরও বেটার কোন প্ল্যানে আসে নাকি মাথায়। রাতে ছাদে গিয়ে না হয় চা কফি খেতে খেতে কাজ করা যাবে। আমি হেল্প করবো তোকে চিন্তা করিস না। সেরা প্রোগ্রামটাই তোকে করে দেওয়ার চেষ্টা করবো। হুম?

রাত ৯টা। খাবার নামাজ শেষে ল্যাপটপ, যন্ত্রপাতি নিয়ে ছাদে এসে টেবিলে সব রেখে চেয়ারে বসে আছি। একটা ইলেকট্রিক কয়েল অন করে রেখেছি। আমাদের বাড়িটা শহর থেকে অনেক দূরে ফলে কোন শোরগোল হট্টগোলও নাই। পায়ের শব্দ শুনে পিছনে তাকাতেই দেখি আপু চলে এসেছে।

-হাতের কাজ করতে দেরি হয়ে গেলো রে। সব কি রেডি তোর?

-হুম আপু।

টেবিলে কফির ফ্লাস্ক আর মগ দুইটা রেখে সামনে রাখা চেয়ারে আপু বসলো।

-হুম চল। এবার শুরু করা যাক। আমি কিন্তু বেশি সময় দিতে পারবো না। সর্বোচ্চ দেড় ঘণ্টা।
-আচ্ছা আপু। সমস্যা নাই। হাতে ৪ দিন আছে। যথেষ্ট সময় আছে।
-হুম এখন কিভাবে কি করবি বল?
যন্ত্রটা অন করলাম। ডিকোডারের মনিটরে আলো আসতে কিছুটা সময় লাগলো। এরপর ধীরে ধীরে তাতে বিভিন্ন রেঞ্জের ফ্রিকুয়েন্সি দেখা যাচ্ছে। আমি গ্যাংগড টিউনের মাধ্যমে একটা নির্দিষ্ট ফ্রিকুয়েন্সি সিলেক্ট করলাম। তারপর ডিফারেনশিয়েট বাটন চেপে চেপে ওয়েভের একদম ছোট ছোট হারমনিক্সগুলো না দেখা পর্যন্ত ওয়েট করলাম। এরপর ওয়েভ শেপের ডিসটরশন, রেস্পনস গুলো গভীর ভাবে ভেবে ভেবে তা কি ধরনের মিন করতে পারে তা আপুকে বলতে থাকলাম। আপু সেগুলো ল্যাপটপে লিখে লিখে কম্পাইল করছে।
সেদিনের মতো প্রায় টানা দুই ঘণ্টা প্রোগ্রাম লিখেছি।
এইভাবে টানা ৪ দিন পরিশ্রম করে বিভিন্ন রেঞ্জ এবং ব্যান্ডের ফ্রিকুয়েন্সি ডিকোড করার একটা প্রোগ্রাম রেডি করলাম। অর্ধশত বার কম্পাইল করেছে আপু। চেক করে করে দেখেছে বার বার কোন এরর আছে কিনা এবং যথেষ্ট রিলেইবল হবে বলে মনে হয়েছে আমার কাছে।
অবশেষে সেই প্রত্যাশিত শুক্রবার। রাব্বি তার ড্রোন নিয়ে হাজির আমাদের বাড়ির ছাদে। রাব্বিকে সব খুলে বললাম। সেও বেশ উৎসাহ পেলো বলে মনে হচ্ছে। এবং এতো দিন তাকে এ ব্যাপারে কেন জানাইনি সেটা নিয়ে মনে হয় একটু অভিমানও করেছে।
যাগ গে বাড়িতে বানানো নাইলনের সুতা দিয়ে থলের মতো জিনিসটা ড্রোনের সাথে ঝুলে দিলাম আর থলের ভিতর আমাদের যন্ত্রটা রাখলাম। সুইচ অন করে রাব্বিকে উড়াতে বললাম।
সব মিলিয়ে যন্ত্রটার ওজন ৫০০ গ্রামের মতো হবে। রাব্বির ড্রোনের ক্যাপাসিটি ২.২ কেজি। সুতরাং কোন সমস্যা হবে না উড়তে।
রাব্বিকে একদম ৪কিমির পর্যন্ত উপরে নিয়ে যেতে বললাম। ড্রোনটা উড়তে উড়তে একদম ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হতে হতে মিশে যাওয়ার মতো হয়ে যাচ্ছে। ৪ কিমি যাওয়ার পর ওখানে ৪/৫ মিনিট রাখতে বললাম। দেখতে দেখতে আমাদের কাঁধ অবশ হয়ে যাওয়া মতো অবস্থা।
ড্রোন উড়ছে আর আমার বুক টিপ টিপ করছে। এই যে এতো দিনের শ্রম আমার কি সাফল্যের মুখ দেখবে! আমাদের পৃথিবীর আশপাশ দিয়ে চলে যাওয়া কোন ফ্রিকুয়েন্সিকে কি সে ডিটেক্ট করতে পারবে? সত্যিই কি তা আমাদের বোধগম্য হবে? আসলেই সেরকম কোন ফ্রিকুয়েন্সি কি আমাদের বায়ুমণ্ডল ভেদ করে অন্য কোথাও যাচ্ছে কি না! আমার-আপুর শ্রম কি বিফলে যাবে! হে আল্লাহ আমাদের হতাশ করো না।
৪ মিনিট হয়ে যাওয়ার পর ড্রোন নামাবে কিনা রাব্বি জানতে চাইলো। আমি নামাতে বললাম। না জানি আমার যন্ত্রটা গরমে কি হয়ে গেছে।
ছাদে নামাতে আরও প্রায় ১ মিনিট লাগলো।
ছাদে নামানোর সাথে সাথে আমি রাব্বি আর আপু ড্রোনের কাছে দৌড়ে গেলাম। তিন দিক থেকে হাঁটু গেড়ে ঘিরে ধরে বসলাম আমরা। থলের ভিতর থেকে যন্ত্রটা আলতো হাতে বের করে আনলাম। মনিটরে বিন্দু বিন্দু ঘামের মতো সব পরিষ্কার করতেই দেখলাম তাতে ইংরেজি অক্ষরে বড় বড় করে লেখা..... “Liiiffe .....heree..... wee”!

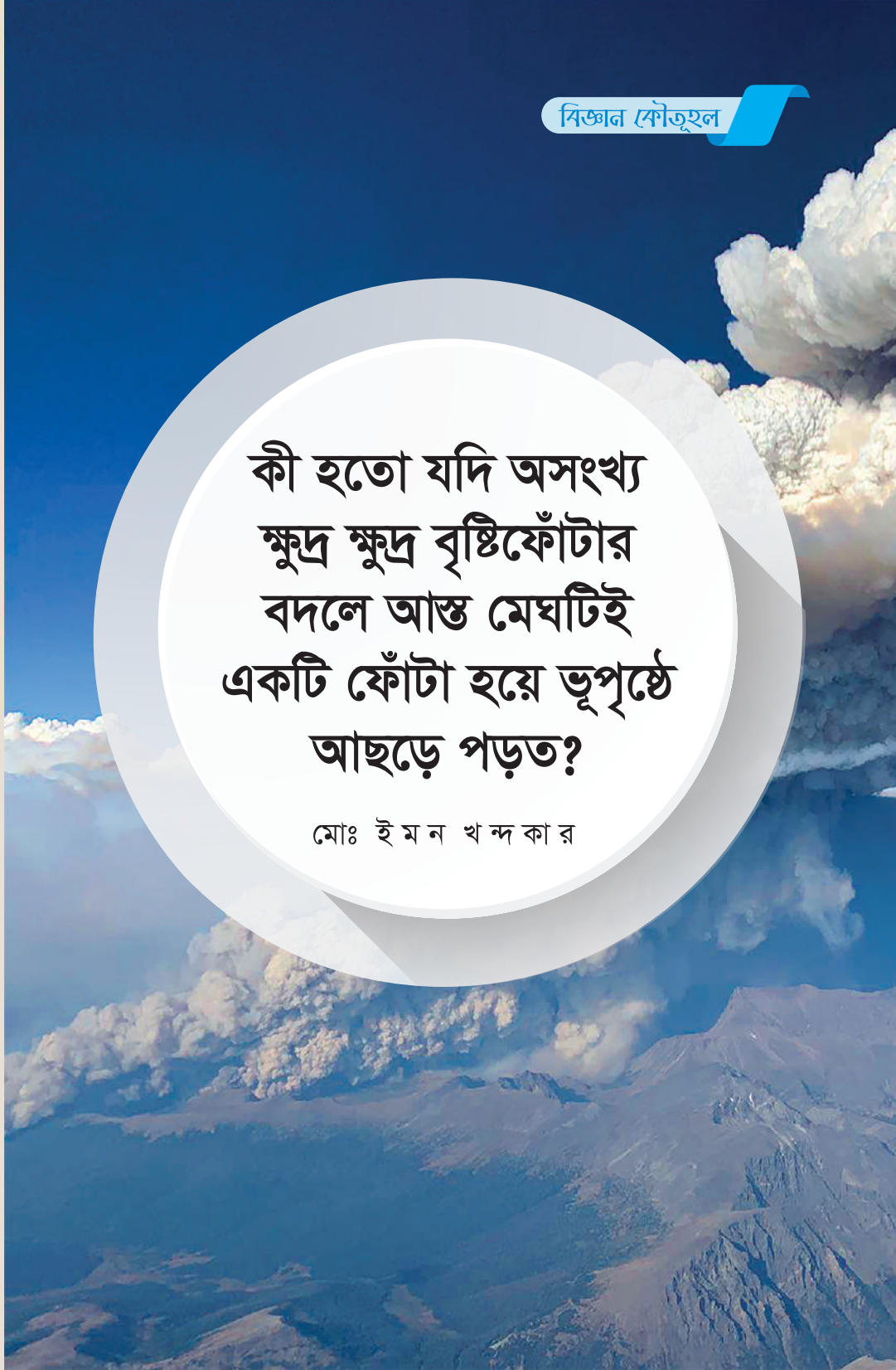

কী হতো যদি অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃষ্টিফোঁটার বদলে আস্ত মেঘটিই একটি ফোঁটা হয়ে ভূপৃষ্ঠে আছড়ে পড়ত?

মোঃ ইমন খন্দকার

বৃষ্টি আমাদের সবার কম-বেশি ভালো লাগে। স্বাভাবিক নিয়মে, আমরা জানি এবং দেখি যে ভূপৃষ্ঠ থেকে পর্যায়ক্রমে পানি বাষ্পীভূত হয়ে আকাশে গিয়ে মেঘে পরিণত হয় এবং সেখান থেকে তা আবার বৃষ্টি নাম ধারণ করে ফোঁটায় ফোঁটায় পতিত হয়ে ভূপৃষ্ঠেই ফিরে আসে। কিন্তু, কখনো ভেবে দেখেছো কি, কেন মাথার ওপরের আস্ত প্রকাণ্ড মেঘটা একেবারে ভূপৃষ্ঠে আছড়ে না পড়ে ফোঁটায় ফোঁটায় বর্ষিত হয়? অথবা, কেমন হতো যদি এমনটা সত্যিই কখনো ঘটত! আজ, সেগুলো নিয়েই আমরা একটু গবেষণা করব। তবে, এজন্য তোমাকে বড় কোনো গবেষক হতে হবে না। বিজ্ঞান বিষয়ে তোমার ন্যূনতম জ্ঞানটকু কাজে লাগাতে পারলেই চলবে। বাকি যা যা তথ্য লাগবে, আমি সরবরাহ করতে থাকব। চলো তবে শুরু করি।

আমরা পুরো বিষয়টাকে বর্ণনার জন্য আমাদের তীক্ষ্ণ কল্পনাশক্তির ব্যবহার করব। ধরে নাও এখন, এই মুহূর্তে, যখন তুমি এই লেখাটি পড়ছো, তখন গ্রীষ্মকাল। স্বাভাবিকভাবেই, বাইরে প্রচণ্ড গরম। এদিকে, ঘরে লোডশেডিং। তুমি বারান্দায় বসে বসে ফেইসবুক ঘাঁটছো আর রুমাল দিয়ে একটু পর পর ঘাম মুচ্ছ। হঠাৎ, তুমি আবিষ্কার করলে, দূর দিগন্তে বিশালাকার একটি কালো মেঘ ঘনীভূত হচ্ছে। তুমি চিন্তা করলে, "ভালো তো! এবার হয়তো একটু রেহাই পাব!" কিন্তু, একটু পরই খেয়াল করলে, এর আকার নিতান্ত অনিয়মিত! স্বাভাবিক আর পাঁচটা মেঘের মত নয়। আরেকটু পর দেখলে, এর ওপরের দিকটা ছাতার মত প্রসারিত আর নিচের দিকটা সূচের মত সূক্ষ্ম। সাধারণ বৃষ্টিকণার উল্টো! একপর্যায়ে পুরো আকাশটাই কালো হয়ে গেলো। বায়ুপ্রবাহের গতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিকের চেয়ে বাড়তে লাগলো। তোমার চারপাশের সবকিছু নড়ছে। চোখে ধুলোবালি ঢুকেছে, তুমি চোখ মুচ্ছ। মেঘের আকার যেন প্রতি সেকেন্ডেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আরেকটু চিন্তা কর, বিশাল এই পানির কণাটির ভর প্রায় একশ মিলিয়ন টন। যার প্রস্থ, প্রায় ১ মাইল! তোমার মাথার মাত্র কয়েক মাইল ওপরেই মেঘটা ইতোমধ্যে চলে এসেছে। তোমার হৃদকম্পন ধীরে ধীরে বাড়ছে। কপাল ঘেমে যাচ্ছে। পরবর্তী কয়েক মিনিট এভাবেই চলে গেল। দাঁড়াও! তুমি হয়ত ভাবছো, বাইরে এমন ভয়াবহ অবস্থা, আর আমি কেন পাগলের মত বারান্দায় বসে এসব দেখব? কেন এক দৌড়ে ঘরে ঢুকব না?

ঠিক আছে, বাঁচার জন্য এবার তুমি দ্রুত ঘরে ঢুকলে। দরজা-জানালা সব বন্ধ করলে। জানালার সামনে বসলে। স্বচ্ছ কাচের ভেতর দিয়ে বাইরের সবকিছু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। যতই কালক্ষেপণ হচ্ছে, কণাটি বিশাল থেকে বিশালতর হচ্ছে। আর ততই যেন ভূপৃষ্ঠের নিকটবর্তী হচ্ছে। এবার বিষয়টি তোমার কাছে আরও সুস্পষ্ট হচ্ছে। তুমি বুঝতে পারছো, ফোঁটাটির গতিবেগ প্রতি সেকেন্ডে ৯.৮ মি/সে করে বৃদ্ধি পাচ্ছে (অভিকর্ষজ ত্বরণের কথা বলছি!)। একপর্যায়ে, অত্যধিক ভরের কারণে এর ভরবেগ প্রায় ২০০ কেজি মাইল/ঘণ্টা হয়ে গেলো। এর আকৃতি এখন পূর্বের তুলনায় উল্টো! অর্থাৎ, অভিকর্ষের কারণে এর নিচের অংশ এবার প্রসারিত এবং উপরের অংশটি সংকুচিত হয়ে গিয়েছে। এটি যতই নিচের দিকে নামছে, এর সবচেয়ে বাইরের স্তরের পানিগুলো ধীরে ধীরে বায়ুর সাথে মিশে ফেনিল হয়ে উবে যাচ্ছে। আর কয়েক মুহূর্ত বাকি, এরপরই ঘটনাটি ঘটতে চলেছে। কিন্তু, ফোঁটাটি ভূমি স্পর্শ করার ঠিক আগ মুহূর্তে (কয়েক মিলি সেকেন্ডের জন্য) সেখানে আগুন ধরে যাবে! এর কারণ, যখন সম্পূর্ণ ফোঁটাটি (হিসেবের সুবিধার্থে এটিকে একটি বড় পাথর খণ্ড কল্পনা করুন) ভূমি হতে কয়েক মিলিমিটার ওপরে তখন বায়ু এর তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার মত যথেষ্ট সময়ও পাবে না। যার ফলে,

ভূমি ও ভরের (ফোঁটা) মধ্যবর্তী স্থানে প্রবল চাপের কারণে একটি আগুনের সৃষ্টি হয়। এর তাপমাত্রাও অত্যাধিক!

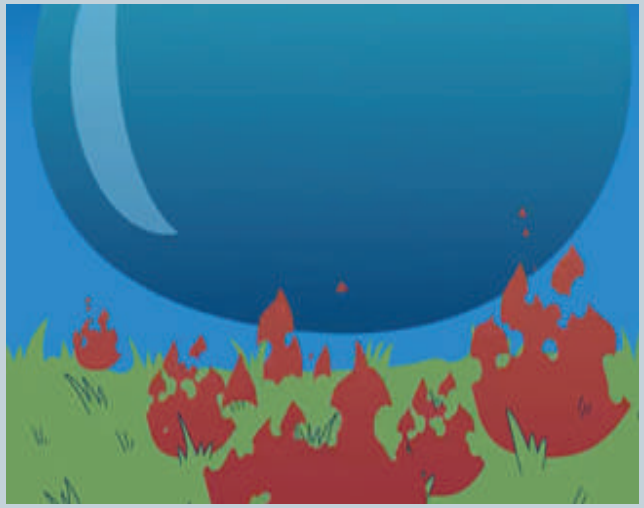

কিন্তু, এটি কয়েক মিলি সেকেন্ড স্থায়ী। কারণ, মুহূর্তেই লক্ষ লক্ষ টন পানি এর উপর আছড়ে পড়ে। ঠিক সেই মুহূর্তে, পানির স্রোতে সবকিছু প্রায় তুলোধুনো হয়ে গেছে, যার গতিবেগ অন্তত ৪৫০ মাইল/সেকেন্ড!

আচ্ছা, এইতো গেলো যখন তুমি কোনো নিরাপদ আশ্রয়ে আছো তখন। কিন্তু, কি হবে যখন তুমি ঠিক এর নিচেই অবস্থান করছ? চলো এবার সেটা একটু দেখি।

এখন, এই অবস্থায়ও যদি তুমি বেঁচে থাকার আশা কর তাহলে সেটা খানিকটা এমন হতে পারে যে, তুমি হয়ত তোমার মাথা বরাবর উল্লম্বভাবে হাত দুটো প্রসারিত করে ডুবন্ত পানির মধ্যে সাঁতরাতে চাইবে! কিন্তু জনাব, ভেবে দেখেছো কি, প্রায় ১ মাইল লম্বা ও চওড়া একটি ভারী বস্তু তোমার ওপর আছড়ে পড়েছে! যদি ধরেও নিই যে এরপর তুমি বেঁচে আছো, তাহলে তুমি যে পানিতে ডুবে আছো তা তোমাকে ১৫৫ atm চাপ দিতে থাকবে প্রতি মুহূর্তে। যা স্বাভাবিক পরিবেশে তোমার অনুভূত চাপের ১৫৫ গুণ! অন্যদিকে, গবেষকদের মতে একটি মানবদেহ সর্বোচ্চ ৭১ atm অবধি চাপ সহ্য করতে পারে।

এবার, যদি এমন হয়, যে তুমি এর একদম তলায় না নিচেই একটু পাশে দাঁড়িয়ে আছো। তাহলেও তেমন কোনো লাভ হবে না। কারণ এর অত্যধিক গতিবেগ তোমাকে চোখের পলকে দৃষ্টির শেষ সীমায় পৌঁছে দেবে। কাজেই, এমনটা চিন্তা না করাই ভালো।

এবার চলো, আবার আগের দৃশ্যে ফিরে যাই। তুমি ঘরের জানালা দিয়ে বাইরে এই হরর মুভি সদৃশ অনিয়মিত ঘটনাগুলি ঘটতে দেখছো।

তুমি দেখলে, সুবিশাল একটি মেঘ খণ্ড ভূপাতিত হয়ে স্বভাবতই বিস্ফোরণের ন্যায় ছড়িয়ে পড়ছে পুরো শহর জুড়ে। ঘর, বাড়ি, সেতু, গাছপালা সবকিছু ধূলিসাৎ করে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এরপরের দৃশ্যপটটুকু তোমার কাছে আর অদ্ভুত ঠেকবে না। অর্থাৎ, এরপরই এর নাম হয়ে যাবে বন্যা! অর্থাৎ, সবকিছু বন্যায় ভেসে যাবে।

যাই হোক, এটা একটা কল্পকাহিনী ছিল। আমরা শুধু সম্ভাবনাগুলো একটু পরখ করছিলাম। বাস্তবে, এমনটা কখনো ঘটেনি আর ঘটার কোনো কারণও নেই। তবে ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় ১৯৯৫ সালে ব্রাজিলে এবং ১৯৯৯ সালে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের মারশাল আইল্যান্ডে

১৯৯৫ সালে ব্রাজিলে এবং ১৯৯৯ সালে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের মারশাল আইল্যান্ডে পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বড় বৃষ্টিপাত হয়েছিল যার দৈর্ঘ্য ছিল এক ইঞ্চির এক-তৃতীয়াংশ। এমনকি, কিছু কিছু বৃষ্টিপাত কখনোই ভূপাতিত হয় না যাদেরকে বলা হয় "ফ্যানটম রেইন"। এক্ষেত্রে, মেঘগুচ্ছ থেকে বৃষ্টিপাত হয় ঠিকই কিন্তু তা কিছু দূর নেমেই বাষ্পীভূত হয়ে আবার মেঘে পরিণত হয়।

পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বড় বৃষ্টিপাত হয়েছিল যার দৈর্ঘ্য ছিল এক ইঞ্চির এক-তৃতীয়াংশ। এমনকি, কিছু কিছু বৃষ্টিপাত কখনোই ভূপাতিত হয় না যাদেরকে বলা হয় "ফ্যানটম রেইন"। এক্ষেত্রে, মেঘগুচ্ছ থেকে বৃষ্টিপাত হয় ঠিকই কিন্তু তা কিছু দূর নেমেই বাষ্পীভূত হয়ে আবার মেঘে পরিণত হয়।

এবার আমাদের মূল আলোকপাতে আসি। প্রথমে আমাদের জানতে হবে সাধারণ বৃষ্টিপাত আসলে কিভাবে হয়।

আমরা জানি, ভূপৃষ্ঠের পানি থেকে মেঘের সৃষ্টি। আসলে প্রতিটি মেঘ একেকটি উন্মুক্ত জলাশয় যার কোনো প্রাচীর নেই। যেখানে পানির কণাগুলো প্রাথমিক স্তরে সবাই মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। একপর্যায়ে, বায়ুমণ্ডলের hygroscopic particles বা জলগ্রাহী কণাগুলো মেঘের ভেতর এসে সক্রিয় হয়। এই কণাগুলোর কাজ অসংখ্য পানির অণু একত্রিত করে একটি পানির কণা তৈরি করা। কারণ, এদের নামই পানিগ্রাহী বা পানিশোষক।

কণার গতিতত্ত্ব অনুযায়ী, এই কণাগুলির শোষণক্ষমতা প্রবল হলে সেগুলো বরফকণা উৎপন্ন করে। আর তা তুলনামূলক কম হলে সেগুলো মেঘের কণা উৎপন্ন করে। কাজেই, মেঘ মূলত তুষার কণা এবং বৃষ্টি কণার একটি মহাসম্মিলন। এছাড়া, বৃষ্টিপাতের উৎপত্তি কার্যত তুষারপাত দিয়েই শুরু হয়। অর্থাৎ, আমরা যেটাকে

বৃষ্টিপাত বলি তা প্রাথমিকভাবে প্রতিবারই তুষারপাত হয়ে মেঘে থেকে যাত্রা শুরু করে। কিছুদূর অতিক্রম করার পর যখন তা পৃথিবীর স্বাভাবিক বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে তখন উষ্ণতার পার্থক্যের জন্য বৃষ্টিতে পরিণত হয় এবং বৃষ্টিপাত নাম ধারণ করে!

এজন্যেই কখনো প্রকাণ্ড মেঘখণ্ড একেবারে বর্ষিত না হয়ে উপর্যুক্ত কারণে ফোঁটায় ফোঁটায় বর্ষিত হয়ে আমাদের প্রাণ রক্ষা করে থাকে। নাহলে ভেবে দেখেছেন, কী হত! আমরা সবাই মারা পড়তাম! বৃষ্টির বৃহত্তর ফোঁটাগুলো কিন্তু ক্ষুদ্রতরগুলির তুলনায় দ্রুততর। সাধারণ একটি বৃষ্টির ফোঁটার গতিবেগ ঘণ্টায় ২২ কিলোমিটার হয়ে থাকে। সাধারণত মেঘের অবস্থান তোমার মাথা থেকে আরও প্রায় ২২৫০ ফুট ওপরে হয়ে থাকে। এই উচ্চতায় মেঘের অবস্থান হয় যখন সে বৃষ্টিপাত করতে থাকে।

এজন্য, এই উচ্চতা থেকে অর্থাৎ সাধারণ একটি বৃষ্টি ফোঁটার ভূপাতিত হতে প্রায় ২ মিনিট সময় লাগে। কিন্তু এটি যদি ক্ষুদ্রতম ফোঁটাটি হয় তবে সময় একটু বেশি লাগবে। বিজ্ঞানীদের মতে যার মান প্রায় ৭ মিনিট।

এজন্য, মেঘ প্রকৃত অর্থে অসংখ্য ক্ষুদ্র কণার একটি সম্মিলন যেখানে প্রতিটি কণার ভর অতিনগণ্য অভিকর্ষ বল অনুভবের জন্য, যার ফলশ্রুতিতে সম্পূর্ণ মেঘটি একত্রে ভূপাতিত হয় না। পর্যায়ক্রমে যখন কিছু কণা তুলনামূলক ভারী হয়ে উঠে তখনই মাধ্যাকর্ষণের ডাকে সাড়া দিয়ে সেগুলো মাটিতে নেমে আসে। অর্থাৎ, অভিকর্ষ বল অনুভব করার মত পর্যাপ্ত ভারী হয়ে উঠলেই কেবল তা ভূপাতিত হবে।

আরেকটি কারণ হল, এই অতিনগণ্য ভরবিশিষ্ট কণাগুলোকে অনবরত বায়ুপ্রবাহ এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকে অনেকটা ভাসিয়ে রাখার মত করে।

এই কারণেই আমরা মূলত প্রকাণ্ড একটি মেঘকে কখনো একেবারে বর্ষিত হতে দেখি না। তা সর্বদাই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃষ্টির ফোঁটা হয়ে পতিত হয়, যা নিঃসন্দেহে আমাদের প্রতি মহান আল্লাহ তায়ালার এক রহমত। নচেৎ, কেবল একবার বর্ষণেই ধ্বংস হয়ে যেত মানব সভ্যতা। তাই, এরপর থেকে বৃষ্টি উপভোগ করার সময় তোমার প্রতিপালকের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ভুলবে না যেন! আর হ্যাঁ, লেখার শুরুতে পাঠককে ভয়ঙ্কর এক দুঃস্বপ্ন দেখানোর জন্য, দুঃখিত! ■

তথ্যসূত্র ও ছবি: (ইন্টারনেট)

- *https://brightside.me/wonder-curiosities*
- *https://www.scientificamerican.com*
- *https://pumas.nasa.gov*
- *https://www.pexels.com*

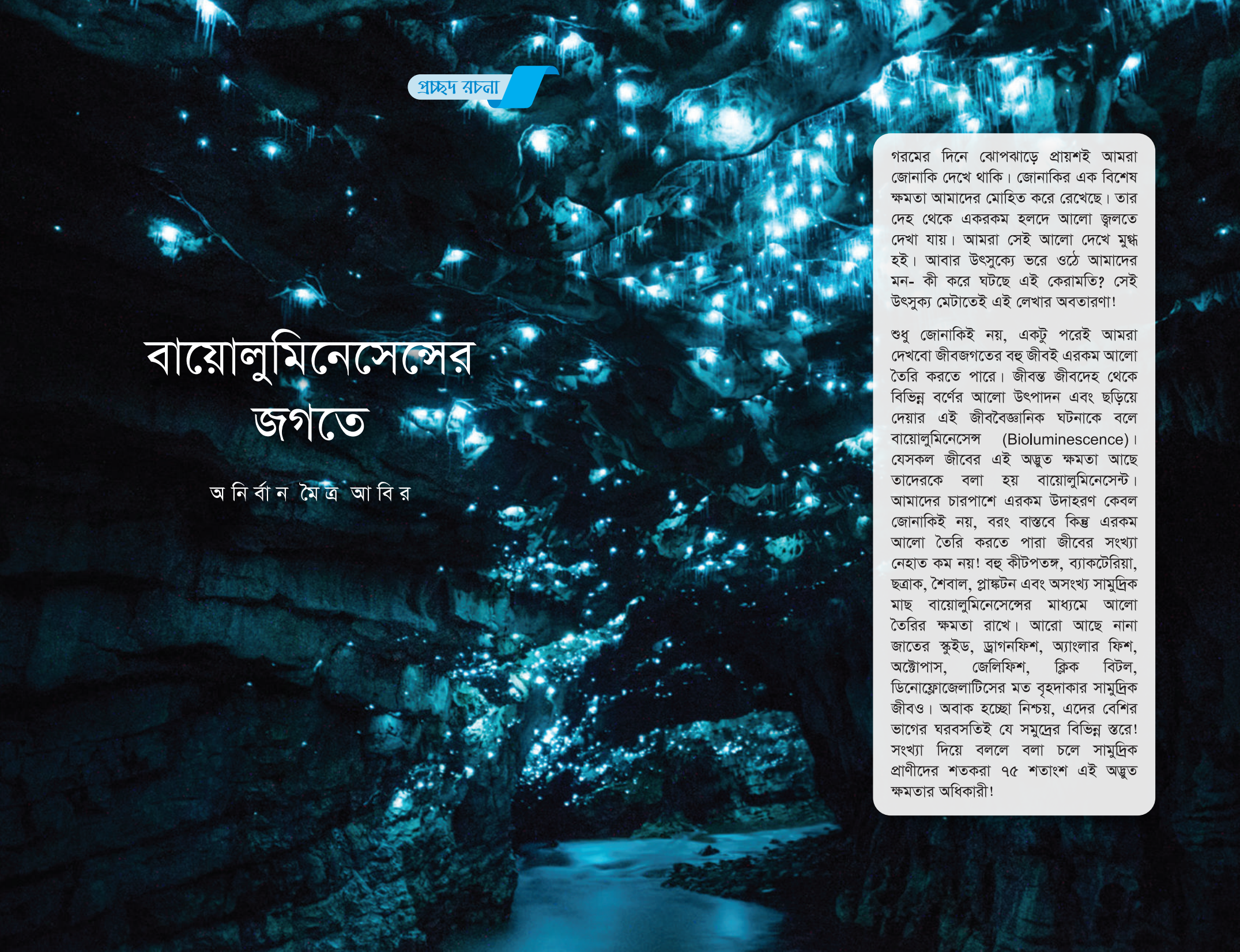

বায়োলুমিনেসেন্সের জগতে

অনির্বান মৈত্র আবির

গরমের দিনে ঝোপঝাড়ে প্রায়শই আমরা জোনাকি দেখে থাকি। জোনাকির এক বিশেষ ক্ষমতা আমাদের মোহিত করে রেখেছে। তার দেহ থেকে একরকম হলদে আলো জ্বলতে দেখা যায়। আমরা সেই আলো দেখে মুগ্ধ হই। আবার উৎসুক্যে ভরে ওঠে আমাদের মন- কী করে ঘটছে এই কেরামতি? সেই উৎসুক্য মেটাতেই এই লেখার অবতারণা!

শুধু জোনাকিই নয়, একটু পরেই আমরা দেখবো জীবজগতের বহু জীবই এরকম আলো তৈরি করতে পারে। জীবন্ত জীবদেহ থেকে বিভিন্ন বর্ণের আলো উৎপাদন এবং ছড়িয়ে দেয়ার এই জীববৈজ্ঞানিক ঘটনাকে বলে বায়োলুমিনেসেন্স (Bioluminescence)। যেসকল জীবের এই অদ্ভুত ক্ষমতা আছে তাদেরকে বলা হয় বায়োলুমিনেসেন্ট। আমাদের চারপাশে এরকম উদাহরণ কেবল জোনাকিই নয়, বরং বাস্তবে কিন্তু এরকম আলো তৈরি করতে পারা জীবের সংখ্যা নেহাত কম নয়! বহু কীটপতঙ্গ, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, শৈবাল, প্লাঙ্কটন এবং অসংখ্য সামুদ্রিক মাছ বায়োলুমিনেসেন্সের মাধ্যমে আলো তৈরির ক্ষমতা রাখে। আরো আছে নানা জাতের স্কুইড, ড্রাগনফিশ, অ্যাংলার ফিশ, অক্টোপাস, জেলিফিশ, ক্লিক বিটল, ডিনোফ্লোজেলাটিসের মত বৃহদাকার সামুদ্রিক জীবও। অবাক হচ্ছো নিশ্চয়, এদের বেশির ভাগের ঘরবসতিই যে সমুদ্রের বিভিন্ন স্তরে! সংখ্যা দিয়ে বললে বলা চলে সামুদ্রিক প্রাণীদের শতকরা ৭৫ শতাংশ এই অদ্ভুত ক্ষমতার অধিকারী!

একটা জিনিস স্পষ্ট করে রাখি আলো তৈরির ঘটনা প্রকৃতিতে আরো অনেক রকম আছে। অনেক জীব বাইরের উৎস থেকে আলো শোষণ করে তাকে ছড়িয়ে দেয়। কিন্তু সেটাকে আমরা বায়োলুমিনেসেন্স বলবো না। বায়োলুমিনেসেন্স হতে হলে জীবদেহের অন্তঃরাসায়নিক ক্রিয়াতেই আলো তৈরি হতে হবে। এখন আসা যাক বায়োলুমিসেন্স কিভাবে কাজ করে- এই প্রশ্নে। সাধারণভাবে বর্ণনা করলে প্রক্রিয়াটি অনেকটা এমন- বিশেষ একটি ফটোপ্রোটিন (বা কিছু প্রজাতিতে কোনো আয়ন) কোনো আলো উৎপাদনকারী উপাদানকে ভাঙে। আর তখন উপজাত হিসেবে আলো নির্গত হয়। সাধারণত যে উপাদানটি আলো তৈরি করে সেটির নাম লুসিফারিন (আলো উৎপাদনের বৈশিষ্ট্যধারী যৌগ)। আর যে উপাদান বা এনজাইম এখানে ক্রিয়া করে তার নাম লুসিফারেজ। এদের যৌথ ক্রিয়ায় অক্সিলুসিফারিন নামক একটি অস্তিতিশীল যৌগ তৈরি হয়। আর সাধারণ পদার্থবিদ্যার নিয়ম মেনেই একে শক্তি বিকিরণ করে স্থিতিশীল অবস্থায় আসতে হয়। স্থিতিশীল অবস্থায় আসার সময় সেই শক্তি মূলত বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোকশক্তি হিসেবে বিকিরিত হয়। তখন আমরা বিকিরিত শক্তির তরঙ্গদৈর্ঘ্য অনুসারে নানা রঙের আলো দেখতে পাই।

চিত্র-১: জোনাকির দেহ থেকে ঠিকরে বেড়োচ্ছে আলো; ছবিসূত্র: sarcasm.com

আবার কোনো কোনো সামুদ্রিক প্রাণীর দেহে এর বদলে উপস্থিত থাকে 'একোয়ারিন' নামক ফটোপ্রোটিন। ক্যালসিয়াম আয়নের প্রভাবকীয় ক্রিয়ায় এই প্রোটিনটি অক্সিজেন দ্বারা জারিত হয়ে অক্সিলুসিফারিনের মতোই আরেকটি যৌগ তৈরি করে-সেটি হলো নীলচে আলো বিকিরণকারী 'সিলেন্ট্রামাইড'। বায়োলুমিনেসেন্টদের দেহে এই প্রক্রিয়াগুলো মোটামুটি স্বতঃস্ফুর্তভাবে ঘটে থাকে।

আমাদের কাছে এই আলো সৌন্দর্যের বিষয় মনে হতে পারে, কিন্তু বায়োলুমিনেসেন্ট জীবদের জন্য তা জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। কেননা বিবর্তনের ধারায় এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেই এরা আজকের অবস্থায় পৌঁছেছে। তাই এটা সহজেই অনুমেয় যে, বায়োলুমিনেসেন্স সংশ্লিষ্ট জীবদেরকে বেঁচে থাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। দেখা গিয়েছে এই আলো জীবগুলোর শিকার খোঁজা, শিকারির হাত থেকে বাঁচার জন্য ছদ্মবেশ ধারণ, একই প্রজাতির অন্য প্রাণীর সাথে যোগাযোগ, সঙ্গীকে আকৃষ্ট করা, বহিরাগতকে সতর্ক করা সহ আরো অনেক কাজে ব্যবহার করে। চলো এবার কিছু বায়োলুমিনেসেন্টের উপর আলোকপাত করা যাক।

জোনাকি দিয়েই শুরু করি। স্থলভাগের বায়োলুমিনেসেন্ট জীবদের মধ্য জোনাকিই আমাদের সবচেয়ে পরিচিত। জোনাকির সকল প্রজাতি আবার আলো দিতে পারে না, কেবল বিশেষ কিছু প্রজাতির এ ক্ষমতা আছে। জোনাকি তার আলো ব্যবহার করে নিজের প্রজাতিগত পরিচয় জানান দেয় এবং

চিত্র-২: জঙ্গলজুড়ে জোনাকির ঝাঁক; ছবিসূত্র: Medium

বিপরীত লিঙ্গের প্রতি ভালোবাসা নিবেদন করে মিলনের আমন্ত্রণ জানায়। এদের দেহের নিচের দিকের যে অংশে হলদে আলো উৎপন্ন হয়, সেই অংশটি বেশ পাতলা এবং স্বচ্ছ। প্রজনন ঋতুতে বনজঙ্গল জোনাকিতে ছেয়ে যায়. তখন এরা নৃত্যের ভঙ্গিতে টিম টিম করে জ্বলতে থাকে। প্রজাতিভেদে আবার তাদের নাচের ধরন আলাদা হয়। Photinus pyralis প্রজাতিতে পুরুষ জোনাকি ওপর-নিচে উড়ে আলো জ্বালতে থাকে আর স্ত্রী জোনাকি বসে থাকে পাতা বা অন্য কোথাও। উজ্জ্বল বা তীব্র আলো শক্তিশালী সঙ্গীর পরিচয় বহন করে। পুরুষটির আলো দেবার মোটামুটি দুই সেকেন্ড পরে স্ত্রী জোনাকি ফিরতি আলো জ্বালিয়ে আগ্রহসূচক বার্তা দেয়।

জোনাকির আলো জ্বালানো এখানেই শেষ নয়! অবাক করা বিষয় হলো স্ত্রী জোনাকিরা কখনো কখনো বায়োলুমিনেসেন্সের ক্ষমতা ব্যবহার করে আলোক-সৌন্দর্যের ফাঁদ পাতে। আলোর আকর্ষণে বিভ্রান্ত হয়ে অন্য প্রজাতির জোনাকি যখন মিলনের জন্য কাছে আসে, তখন স্ত্রী জোনাকিটি তাকে শিকার করে খেয়ে ফেলে!

চিত্র-৩: বায়োলুমিনেসেন্ট ক্লিক-বিটল; ছবিসূত্র: Natural World

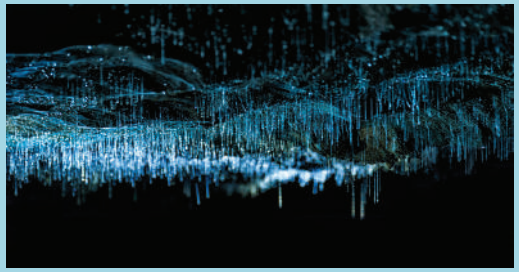

চিত্র-৪: Arachnocampa luminosa প্রজাতির আলোর জাল; ছবিসূত্র: Flickr

জোনাকির ক্ষেত্রে সাধারণত একরকম আলোই দেখা যায়। অন্যদিকে 'ক্লিক বিটল' গুবরে পোকার আলোর রঙ আবার নির্ভর করে তার মেজাজ-মর্জির ওপর। প্রজনন মৌসুমে সঙ্গীকে আকৃষ্ট করার জন্য এদের তলপেট থেকে কমলা রঙের আলো নিঃসরণ হয়। আর যখন সে শিকারের আভাস পায় তখন নিঃসরণ করতে থাকে সবুজ আলো।

বিটলের মতো শিকারের স্বার্থে বায়োলুমিনেসেন্স এর ব্যবহার দেখা যায় Arachnocampa luminosa নামের পতঙ্গ প্রজাতিতে। নিউজিল্যান্ডের গহিন জঙ্গলের গুহায় দেখা মেলে এদের। এদের লার্ভা মাকড়সার জালের মতো করে বিস্তৃত হয়। এই জাল থেকে নির্গত উজ্জ্বল আলো বাইরের পোকামাকড়কে আকর্ষণ করে। চকচকে আলো দেখে বোকা বনে গিয়ে যারা জালে আটকা পড়ে তাদের দিয়েই ওই পতঙ্গ আহার সেরে নেয়।

চিত্র-৫: নিউজিল্যান্ডের ওয়াইটোমো গুহায় জ্বলজ্বলে গ্লো ওয়ার্ম; ছবিসূত্র: *architecturendesign.net*

অনেক পতঙ্গের লার্ভা আবার বায়োলুমিনেসেন্স ব্যবহার করে পাখি, ব্যাঙ কিংবা অন্য শিকারি প্রাণীদেরকে দূরে রাখে। যেমন ডায়মন্ড ওয়ার্ম, রেইলরোড ওয়ার্ম এবং গ্লো ওয়ার্ম রেইল। রোড ওয়ার্ম আবার বেশ শৌখিন, এদের মাথার দিকটা জ্বলে লাল রঙে, আর দেহের নিচের দিকটা সবুজ রঙে।

এবার চলো প্রাণীপ্রজাতির বাইরে আসি। অন্যতম গুরত্বপূর্ণ জীবরাজ্য ছত্রাকের প্রায় আশিটির'ও বেশি বায়োলুমিনেসেন্ট প্রজাতি আবিষ্কৃত হয়েছে এ পর্যন্ত। মূলত গরমপ্রধান ক্রান্তীয় বনজঙ্গলেই এদের দেখা যায়। পরিচিত ছত্রাক প্রজাতির মধ্যে বিটার অয়েস্টার (Bitter oyster) এর কথা উল্লেখযোগ্য। প্রজাতিটির মূল নাম Panellus stipticus। তবে উজ্জ্বল ঝিনুক বা গুগলির মতো দেখতে বলে তাদের এরকম নামকরণ। অস্ট্রেলিয়া, এশিয়া, আমেরিকার ট্রপিকাল জঙ্গলে মূলত বার্চ, ওক কিংবা বিচ গাছে এদের দেখা মেলে। সূর্য ডুবলে চারপাশকে এক অপার্থিব আলোয় ঝলমলিয়ে দেয় এই বিশেষ প্রজাতির ছত্রাকটি।

চিত্র-৬: অন্ধকারে অপার্থিব সৌন্দর্য ছড়ায় বিটার অয়েস্টার; ছবিসূত্র: architecturendesign.net

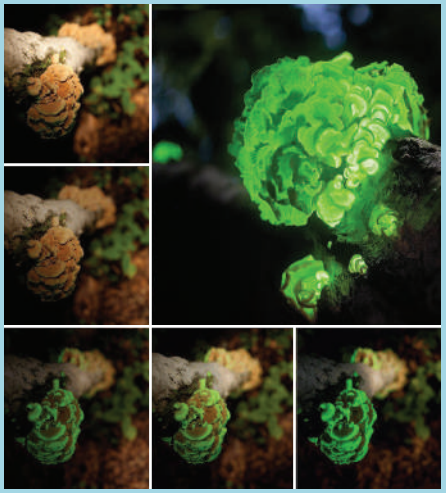

চিত্র-৭: বিভিন্ন প্রজাতির ফক্স ফায়ার; ছবিসূত্র: Pinterest

কিছু বায়োলুমিনেসেন্ট ছত্রাক যেমন Omphalotus olearius, Omphalotus nidiformis এদের পাওয়া যায় ভেজা অথবা পচা কাঠের গুঁড়িতে। এরা সবুজ বা নীলচে সবুজ আলো বিচ্ছুরণ করে থাকে। ছত্রাকদের বায়োলুমিনেসেন্সকে আবার একটি বিশেষ নামে ডাকা হয়- ফক্সফায়ার। ফক্সফায়ার মূলত স্পোর ছড়ানোর জন্যে কীটপতঙ্গকে আকৃষ্ট করে। আবার এই উজ্জ্বল আলো ভক্ষকদেরকেও দূরে রাখে। ফক্সফায়ারের আলো ক্ষেত্রবিশেষে এমন আলোরও যোগান দিতে পারে, যা বই পড়ার জন্য যথেষ্ট। এমনকি ইতিহাস থেকে জানা যায় ব্যারোমিটার এবং কম্পাসের কাঁটাকে আলোকিত করতেও একসময় ফক্সফায়ার এর ব্যবহার ছিল!

সোমালিয়ার দক্ষিণ উপকূলে ভারত মহাসাগরে প্রায় আড়াইশো বর্গকিলো এলাকা জুড়ে মাঝে মাঝেই দেখা মেলে দুধ-সাদা ফেনিল জলের। আন্দাজ করতে পারছো নিশ্চয়ই, এটাও বায়োলুমিনেসেন্সেরই কেরামতি। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হত এই আলো সৃষ্টির জন্য দায়ী ডিনোফ্লাজেলাটিস ছত্রাক। পরবর্তীতে গবেষণায় দেখা গেলো কিছু বায়োলুমিনেসেন্ট ব্যাকটেরিয়াও এর জন্য দায়ী। যখন পানিতে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি হয়, তখনি এদের থেকে আলো নির্গত হতে থাকে। একটিমাত্র ব্যাকটেরিয়া থেকে নির্গত আলোর পরিমাণ খুব কম, কিন্তু যথেষ্ট সংখ্যক (প্রায় মিলিয়ন) ব্যাকটেরিয়া একসাথে হলে রীতিমতো আলোকচ্ছটা তৈরি হয়ে যেতে পারে। আর তা এতোটাই উজ্জ্বল হয় যে, স্যাটেলাইট থেকেও চিহ্নিত করা যায় এদের! আরো একটি খবর দিয়ে রাখি, কেবল সোমালিয়ার উপকূলেই নয়, মুম্বাইয়ের জহুর সমুদ্র সৈকত, মালদ্বীপের ভাদু সৈকতসহ আরো কয়েকটি জায়গাতেও এদের দেখা মেলে। নিজের দেহের আলো দিয়ে পুরো এলাকাটাকে ঝলমলে করে তোলে এরা-আর পর্যটকেরা চেয়ে থাকেন অবাক দৃষ্টিতে!

চিত্র-৮: দুধ-সাদা ফ্যানিল হয়ে উঠা সমুদ্রের পানি; ছবিসূত্র: Activetimes

এ তো গেলো কেবল স্থল আর সমুদ্র-উপরিতলের আলোচনা। বায়োলুমিনেসেন্সের প্রকৃত জগতে নামতে হলে তোমাকে পরতে হবে মেরিন পোশাক, আর তারপর পিঠে সিলিন্ডার নিয়ে ডুব দিতে হবে অতল সমুদ্রে!

বায়োলুমিনেসেন্ট জীবদের অধিকাংশই সামুদ্রিক। যেমনটা শুরুতেই বলা হয়েছে, সমুদ্রের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ জীবই বায়োলুমিনেসেন্ট। এদের মধ্যে আছে বিভিন্ন মাছ, অমেরুদণ্ডী অক্টোপাস, স্কুইড, ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি। সমুদ্রের সকল গভীরতাতেই এদের দেখা মেলে। অধিকাংশ সামুদ্রিক বায়োলুমিনেসেন্ট জীব নীল-সবুজ রং নিঃসরণ করে থাকে। এর কারণ হয়তো এই, সমুদ্রের জীবদের অধিকাংশই এই দুটি রঙে সংবেদনশীল।

তো শুরু করা যাক একটু নিম্ন শ্রেণীর প্রাণ দিয়ে। সমুদ্রের উপরিতলে এবং গভীরে বহু বায়োলুমিনেসেন্ট ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, ও শৈবালের বাস। যেমন ডিনোফ্লাজেলাটিস, Vibrio fischeri, Vibrio harveyi। মিল্কি সি'র আলোচনাতেও আমরা এদের নাম করেছিলাম। এরা একসাথে মিলে সমুদ্রে ফাইটোপ্লাংকটন তৈরি করে একজোট হয়ে থাকে। যখন কোনো মাছ, অথবা কোনো চিংড়ি এদের বিরক্ত করে এরা নীলচে আলো জ্বালতে থাকে। আপনি হয়তো ভাববেন, ওহ আচ্ছা চিংড়িটাকে ভয় দেখাচ্ছে.এই তো ব্যাপার?

না। এটাই পুরো ব্যাপার না। প্রকৃতির রহস্য আরো নিগূঢ়। একটা প্রবাদ শুনে থাকবে হয়তো, The enemy of enemy is my friend অর্থাৎ শত্রুর শত্রু বন্ধু। আন্দাজ করতে পারছো কি?

জীব বলতে কষ্ট হয়- এমন কিছু জীব জোট বেঁধে আলো জ্বালবে কি শুধু ভয় দেখাতে? মজার ব্যাপারটি হলো, যখন কোনো মাছ প্লাংকটন সেবন করতে আসে, তখন আলো জ্বালিয়ে প্লাংকটন মূলত বড় শিকারিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এতে বড় মাছ ছুটে আসে প্লাংকটন ভোজন করতে আসা মাছদের শিকার করতে, আর এতে বিপদমুক্ত হয় প্লাংকটন। কে জানতো, সমুদ্রের তলেও এরকম বিপদ-ঘণ্টার ব্যবস্থা আছে?

বেশ কিছু প্রজাতির হাঙর ও তিমি সত্যিই কিন্তু এই সংকেত বুঝে ফেলে। প্লাংকটন তাদের খাদ্য নয়, কিন্তু তবুও তারা সমুদ্রে প্লাংকটন খোঁজে বেড়ায়। প্লাংকটন নিজের খাদক দেখে আলো জ্বালায়, আর তাতেই তাদের ভুঁড়িভোজের ব্যবস্থা হয়ে যায়!

চিত্র-৯: ডিনোফ্লাজেলাটিসের বায়োলুমিনেসেন্সে আলোকিত সৈকত; ছবিসূত্র: Daily Mail

এ তো গেলো একটা কাজ। এছাড়া বিভিন্ন প্রকার সামুদ্রিক ব্যাকটেরিয়া আলো বিকিরণ করে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করতে, এবং নিজের সহযোগী বা শত্রুদের চেনার জন্যে। একে বলে কোরাম সেন্সিং। সি ফায়ার-ফ্লাইরা সচরাচর হালকা আলো নিঃসরণ করে। কিন্তু শত্রু বা অন্য প্রাণীর উপস্থিতিতে তীব্র নীল আলোর ছটায় চারদিক আলোকিত করে তোলে। জলের উপরিতলের কাছাকাছিই এদের পাওয়া যায়। জানা যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন জাপানি সেনাবাহিনী গেরিলা আক্রমণে আলোর জন্যে এই সি ফায়ার-ফ্লাই ব্যবহার করতো। এছাড়া আছে ক্লাস্টারউইংক শামুক! কোনো জীব এদের স্পর্শ করলে বা কোনো বিপদে পড়লে এরা খোলসে ঢুকে পড়ে। আর এই খোলস থেকে এরা টিম টিম করে আলো জ্বালতে থাকে। শামুকের এই আলোর উৎস হলো এর গায়ে বাস করা বায়োলুমিনিসেন্ট ব্যাকটেরিয়া।

চিত্র-১০: সমুদ্রের উপরিতলে বসবাস করে সি ফায়ারফ্লাই; ছবিসূত্র: Lonely Planet

সমুদ্রের প্রাণীদের আলোচনা করতে গেলে স্কুইভের কথা আসবেই। এদের বহু প্রজাতির আলো তৈরির ক্ষমতা রয়েছে এবং তা তারা ব্যবহার করে থাকে বিভিন্ন ভাবে। স্কুইডের দেহেও আলো তৈরির মূল উৎস হলো কিছু বায়োলুমিনেসেন্ট ব্যাকটেরিয়া। এই ব্যাকটেরিয়া ও স্কুইড হলো মিথোজীবী (Simbiont) অর্থাৎ এরা একে অপরকে সাহায্যের মাধ্যমে একত্রে বেঁচে থাকে। স্কুইড এই ব্যাকটেরিয়াগুলোকে খাদ্যের জোগান দেয়। আর প্রতিদানে ব্যাকটেরিয়াগুলো নিজেদের বায়োলুমিনেসেন্স ক্ষমতা দিয়ে স্কুইডদের শত্রু থেকে রক্ষা করে। যেসব স্কুইড অগভীর

সমুদ্রে থাকে, তারা শিকারি দেখলে এক ধরনের ঘন কালি ছুঁড়ে দিয়ে পালায়। কিন্তু গভীর জলের স্কুইডরা (যেমন Vampire squid) তা পারে না। এর বদলে তারা শত্রুর দিকে বায়োলুমিনেসেন্ট তরল ছুঁড়ে দেয়। ফলে শত্রু কিছুক্ষণের জন্য দিশেহারা হয়ে পড়ে এবং স্কুইড বিপদস্থল থেকে পালায়।

চিত্র-১১: জ্বলজ্বলে ববটেইল স্কুইড; ছবিসূত্র: Prettyincredible

একই কাজ করে কিছু চিংড়ি (যেমন Acanthephyra purpurea) এবং কিছু জেলিফিশ (যেমন Comb Jelly)। চিংড়িরা আবার মেঘের মতো জলজলে ধোঁয়া তৈরি করে শিকারকে ভড়কে দেয়। কখনও কখনও এই উজ্জ্বল ধোঁয়া আবার শিকারিকেই বড় জন্তুর শিকার বানিয়ে দেয়!

কিছু স্কুইড (যেমন যমন Octopoteuthis deletron) তার শুঁড়ের অংশবিশেষ হতে বিজলির মতো আলো জ্বালিয়ে আবার তৎক্ষণাৎ নিভিয়ে সম্ভাব্য শত্রুকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দেয়। কখনো এরা তাদের একেকটা বায়োলুমিনেসেন্ট শুঁড় খসিয়েও ফেলে, যাতে শিকার এ বিচ্ছিন্ন অংশটা নিয়ে ব্যস্ত থাকে আর স্কুইডটা পালাতে পারে। টিকটিকির লেজের মতো এদের শুঁড়ও

চিত্র-১২, ১৩: বায়োলুমিনেসেন্ট চিংড়ি ও বায়ুলুমনেসেন্ট জেলিফিস; ছবিসূত্র: Reddit

আবার নতুন করে তৈরি হয়। শুধু স্কুইডই নয়, অনেক অক্টোপাস, সি কিউকাম্বার, তারা মাছ (যেমন Brittle stars) ও এই পদ্ধতি অবলম্বন করে। রিফ স্কুইড (Reef Squid) প্রজাতির পুরুষ সদস্যরা ভিন্ন ভিন্ন রঙের আলো নিঃসরণ করতে পারে। যখন স্ত্রী স্কুইডরা ডিম দেয় তখন পরিবারের পুরুষ সদস্যরা ঘরের বাইরে আলো জ্বালিয়ে পাহারা দিতে থাকে। যেন স্পষ্ট সতর্কবার্তা- 'NO ENTRANCE'!

সমুদ্রের বায়োলুমিনেসেন্ট জীবদের একটি চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ক্যামোফ্রাজ (Camouflage) তৈরি করা। ক্যামোফ্লাজ কি জিনিস? বলা যেতে পারে শত্রুর হাত থেকে বাঁচার জন্যে ছদ্মবেশ নেওয়া। হাঙরের মতো কিছু শিকারি প্রাণী নিচ থেকে শিকার করে। তারা লক্ষ রাখে ওপরের দিকে সূর্যের যে আলো আসছে পানিতে তার কোনো ছায়া পড়ছে কি না। যদি পড়ে, তাহলে নির্ঘাত সেখানে একটা শিকার রয়েছে। এই পরিকল্পনাকে ভেস্তে দিতেই গভীর সমুদ্রের অনেক প্রাণী ছদ্মবেশ ধারণের জন্য বায়োলুমিনেসেন্সের সাহায্য নেয়। এর মধ্যে রয়েছে ববটেইল

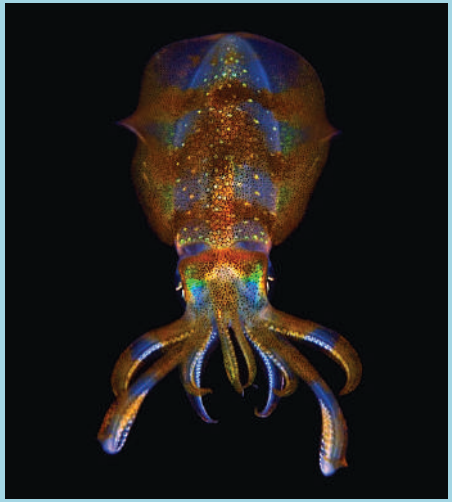

চিত্র-১৪: বর্ণিল রিফ স্কুইড; ছবিসূত্র: Pinterest

স্কুইড, হ্যাচেটফিশ, জেলিফিশ, চিংড়ি এবং বিভিন্ন প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ। এসব প্রাণীদের দেহ থেকে নির্গত আলোর ঔজ্জ্বল্য এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, যে চট করে পরিপার্শ্বের সাথে তাদের রঙ মিলিয়ে যায়। এ কারণে শিকারি প্রাণীগুলো সহজে এদের ধরতে পারে না।

শিকারির হাত থেকে বাঁচার জন্য সামুদ্রিক জীবদের আরো একরকম পদ্ধতি নিতে দেখা যায়। ভাবো তো, অন্ধকার ঘরে হঠাৎ করে যদি তোমার চোখে টর্চের আলো ফেলা হয়, তাহলে কি তোমার চোখ ধাঁধিয়ে যাবে না? চমকে উঠবে না তুমি? তেমনি শিকার করতে আসা প্রাণীরাও বায়োলুমিনেসেন্ট প্রাণীর আলোর ঝলকে হকচকিয়ে যায়। শিকার ধরতেও অনেক বায়োলুমিনেসেন্ট প্রাণী এই পদ্ধতির ব্যবহার করে থাকে। ফ্ল্যাশলাইট ফিশের চোখের কাছে বায়োলুমিনেসেন্ট ব্যাকটেরিয়ার থলি থাকে। এই আলো দিয়ে তারা ছোটো মাছকে অকস্মাৎ চমকে দেয়। ছোটো মাছটা কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই সাবার হয়ে যায় ফ্ল্যাশলাইটের পেটে!

চিত্র-১৫: ফ্ল্যাশলাইট ফিস; ছবিসূত্র: ফোর্বস

গভীর সমুদ্রের কিছু ড্রাগনফিশ (যেমন যমন loosejaw dragonfish) বায়োলুমিনেসেন্স ব্যবহার করে পথ চলার সার্চলাইট হিসেবে। আগেই বলেছি, অধিকাংশ সামুদ্রিক জীব নীল এবং সবুজের মধ্যে আলো তৈরির ক্ষমতা রাখে, এবং এই রঙগুলোতেই তারা সংবেদনশীল। কিন্তু, এই ড্রাগনফিশ লাল আলো নিঃসরণ করে। সামুদ্রিক পরিবেশে বিশেষ সুবিধা পাওয়া যায় এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকায়। কারণটাও বেশ মজার! তার শিকার বেশিরভাগ মাছ এই আলো দেখতে পায় না, ফলত শিকারি খুব সহজেই শিকারকে গ্রাস করে ফেলে!

এবার যার কথা বলবো, তার নাম অ্যাংলার ফিশ! সমুদ্রের প্রায় ২০০০ মিটার গভীরে এই মাছগুলো বিচরণ করে থাকে। দেহের তুলনায় এদের চোয়াল বেশ বড়। তবে এই মাছের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অঙ্গ হচ্ছে এর মাথার সামনের দিকের অ্যান্টেনার মতো প্রবৃদ্ধি। একে বলে ফিলামেন্ট (filament)। ফিলামেন্টের মাথায় বলের মতো অংশ থাকে, যার নাম এস্কা (esca)। এর মধ্যে থাকে বায়োলুমিনেসেন্ট ব্যাকটেরিয়া। ব্যাকটেরিয়ার আলো মাছের টোপ হিসেবে কাজ করে। সমুদ্রে চলতে সাহায্য করা ছাড়াও এ আলো ছোটো ছোটো মাছেদের আকর্ষণ করে। আর

চিত্র-১৬: গভীর সমুদ্রের ড্রাগনফিশ, ছবিসূত্র: ডিউক টুডে

যখন মাছগুলো তাদের ভুল বুঝতে পারে ততক্ষণে তারা অ্যাংলারফিশের শক্ত চোয়ালের মধ্যে চলে এসেছে।

সামুদ্রিক বায়োলুমিনেসেন্ট প্রাণীদের এই যে আলোচনা, তা মোটেই শেষ হবার নয়। এরকম আরো বহু জীব রয়েছে যার বর্ণনা এখানে দেয়া হলো না। বহু জীবের বায়োলুমিনেসেন্সের কারণ বা তার ব্যবহার এখনো অনাবিষ্কৃত রয়ে গিয়েছে। তবুও বিজ্ঞানীরা বসে নেই মোটেই। বায়োলুমিনেসেন্সের রহস্যভেদ করে কিভাবে মানবকল্যাণে একে ব্যবহার করা যায়, তার চেষ্টা চালাচ্ছেন তারা। ইতোমধ্যে কয়েকটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেও ফেলেছেন তারা। ব্যাকটেরিয়ার কোরাম সেন্সিং-এর কথা বলেছি। পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা করার জন্য Vibrio fischeri ব্যাকটেরিয়ার কোরাম সেন্সিংকে কাজে লাগানো হচ্ছে। যখন পানিতে কোনো বিষাক্ততা থাকে তখন এদের আলোর তীব্রতা অনেক কমে যায়। চিকিৎসায়, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এও এর প্রয়োগক্ষেত্র বাড়ছে। উইসকন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা বায়োলুমিনিসেন্ট E.coli ব্যাকটেরিয়ার জিনোমে পরিবর্তন করে বাল্ব হিসেবে ব্যবহারের চেষ্টা করছেন। আমেরিকার রিসার্চ ফার্ম বায়োগ্লো'র গবেষকরা বায়োলুমিনেসেন্ট ব্যাকটেরিয়ার জিন ব্যবহার করে জেনেটিক্যালি মডিফায়েড তামাক গাছ তৈরি করেছেন- যার নাম স্টারলাইট অ্যাভাটার। এরা তাদের জীবনকালের সম্পূর্ণ সময়ই আলো দেয়!

চিত্র-১৭: অ্যাংলার ফিশ; ছবিসূত্র: Pinterest

চিত্র-১৭: স্টারলাইট অ্যাভাটার, ছবিসূত্র: New Atlas

সেইদিনও হয়তো বেশি দূরে নয়, যখন উদ্ভিদগুলো আলো জ্বালিয়ে তাদের পানি-পুষ্টির প্রাপ্যতা, অভাব কিংবা ফল দেওয়ার সময় নির্দেশ করবে। রাস্তার পাশে পৃথক বাতির দরকার হবে না, বায়োলুমিনেসেন্ট উদ্ভিদ পরিবেশ রক্ষা করার সাথে সাথে বিদ্যুৎ খরচও কমিয়ে আনবে। এজন্যে আমরা বরাবরের মতোই সেসব আলোকিত মানুষদের দিকে চেয়ে আছি, যারা বিবর্তনের পথপরিক্রমায় ঠিক বায়োলুমিনেসেন্ট নন কিন্তু যুগ যুগ ধরে তাদের আলো আমাদের কল্যাণের পথ দেখিয়ে এসছে!

কৃতজ্ঞতা:

১. সাগরের রহস্যপুরী, আব্দুল্লাহ আল মুতী
২. *The weird,wonderful world of Biolouminescence,TED-ed:https://youtu.be/lKeDBpkrDUA*
৩. *13 glowing animals in the deep sea,What Lurks Below:https://youtu.be/aIQfTRrD0TE*
৪. *Biolouminescence,Smithsonian:http://ocean.si.edu/ocean-life/fish/bioluminescence*
৫. *Biolouminescence,Britannica Encyclopedia:https://www.britannica.com/science/bioluminescence*
৬. *Biolouminescence explained, Nat Geo:http://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/bioluminescence/*
৭. *Bioluminescent trees could light up your streets,iflscience.org:https://www.iflscience.com/ plants-andanimals/bioluminscent-trees-could-light-our-streets/#xHSR4UHV249qfGtS.01*
৮. *13 glowing animals in the deep sea,What Lurks Below:https://youtu.be/aIQfTRrD0TE*
৯. *Biolouminescence,Smithsonian:http://ocean.si.edu/ocean-life/fish/bioluminescence*
১০. *Biolouminescence,Britannica Encyclopedia:https://www.britannica.com/science/bioluminescence*
১১. *Biolouminescence explained, Nat Geo:http://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/bioluminescence*

চিনে রেখো ওষুধগুলো

আব্দুল্লাহ আল সাকিব

মেথোট্রেক্সেট (Methotrexate)

ক্লাস: এন্টি-ক্যান্সার, ইমিউনো-সাপ্রেসেন্ট

ব্র্যান্ড:

১. Methotrax (ডেল্টা ফার্মা লিমিটেড)
২. Methox (পপুলার ফার্মা লিমিডেট)
৩. Meth (ড্রাগ ইন্টার্ন্যাশনাল লিমিটেড)
৪. Mtrex (টেকনো ড্রাগস লিমিটেড)

রাসায়নিক গঠন:

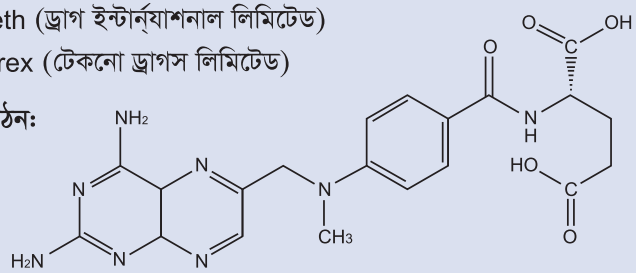

মেথোট্রেক্সেট

চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, মেথোট্রেক্সেট এর রাসায়নিক গঠন অনেকটাই পিউরিন অণুর মতো। পিউরিন এক ধরনের বায়োলজিক্যাল অণু, যা ডিএনএ গঠনে অংশগ্রহণ করে।

পিউরিন অণুর সাথে গাঠনিক সামঞ্জস্যতার কারণে মেথোট্রেক্সেট দেহে তার নানাবিধ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়।

কার্যপন্থা:
মেথোট্রেক্সেট এর কার্যপন্থা বুঝতে হলে আমাদেরকে আগে জানতে হবে ডিএনএ ইউনিটগুলো কিভাবে তৈরি হয়। ডিএনএ একটি পলিমার, যার একক ইউনিটকে বলে নিউক্লিওটাইড। আবার, নিউক্লিওটাইড গঠিত হয় ফসফেট এবং নিউক্লিওসাইড দ্বারা। এরকম একটা গাঠনিক নিউক্লিওসাইড এর নাম থাইমিডিন, যা ডিএনএ তৈরিতে আবশ্যিক। অতএব আমাদের দেহে এই নিউক্লিওসাইডটা তৈরি করতে হবে।

থাইমিডিন তৈরিতে যার ভূমিকা সবথেকে বেশি তার নাম টেট্রা-হাইড্রো-ফোলেট (Tetra hydro folate, THF)। তবে এই কঠিন নামটা বাদেও তার সুন্দর একটা নাম রয়েছে, ভিটামিন-বি-৯। এখন, ভিটামিন-বি-৯ তৈরি হয় ডাই-হাইড্রো-ফোলেট (Di hydro folate, DHF) থেকে। নাম দেখেই বুঝা যাচ্ছে বি-৯ এ চারটা হাইড্রোজেন আছে, যেখানে এর উৎস অণুতে (DHF) রয়েছে দুইটা হাইড্রোজেন। দুইটা হাইড্রোজেন থেকে চারটা হাইড্রোজেন পেতে আমাদের দরকার একটা বিজারন বিক্রিয়া (Reduction) এবং বিজারক। এই বিজারকটা হচ্ছে আমাদের দেহের একটা এনজাইম, নাম ডাই-হাইড্রো-ফোলেট-রিডাকটেজ (Di hydro folate reductase, DHFR)।

ব্যাপারটা কিছুটা এরকম:
DHF > DHFR > THF/Vit-B9 > Thymidine > DNA coPz
মেথোট্রেক্সেট এই DHFR এর সাথে যুক্ত হয়ে তাকে ব্লক করে ফেলে। এনজাইমটির প্রতি মেথোট্রেক্সেট এর আকর্ষণ ভিটামিন-বি-৯ থেকে ১০০০ গুণ বেশি। ফলে DHFR, ভিটামিন-বি-৯ তৈরি করতে পারেনা। ফলে থাইমিডিন তৈরি হয়না, ফলে ডিএনএ কপি হয়না। সবশেষ প্রভাবটা এমন হয় যে কোষ বিভাজন সঠিকভাবে সম্পন্ন হতে পারে না। DHFR অন্যান্য কিছু ডিএনএ ইউনিট (পিউরিন, পাইরিমিডিন প্রভৃতি) তৈরিতেও ভূমিকা রাখে। মেথোট্রেক্সেট তাদের সংশ্লেষণেও ব্যাঘাত ঘটায়।

ক্যান্সার এর মূল সমস্যা হচ্ছে অনিয়ন্ত্রিত কোষ বিভাজন। মেথোট্রেক্সেট এই অনিয়ন্ত্রিত কোষ বিভাজন নিয়ন্ত্রণ করতে ভূমিকা রাখে।

রিউমাটয়েড আর্থ্রারাইটিস চিকিৎসায় মেথোট্রেক্সেট এর ভূমিকাটা কিছুটা ভিন্ন। বিভিন্ন পিউরিন ও পাইরিমিডিন দেহের নানা বিক্রিয়ায় ভেঙে সরল অণুতে পরিণত হয়। মেথোট্রেক্সেট সেসব বিক্রিয়াতে গিয়ে বাধা সৃষ্টি করে। ফলে দেহে এডেনোসিন (পিউরিন নিউক্লিওসাইড) জমা হয়, টি-শ্বেত রক্তকণিকা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। টি এবং বি শ্বেত রক্তকণিকার পৃষ্ঠে নানা ধরনের প্রোটিন সিগন্যাল বাহক থাকে, যারা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে মেথোট্রেক্সেট এর প্রভাবে। ফলে আমাদের ইমিউন ব্যবস্থা (রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা) কিছুটা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।

রিউমাটয়েড আর্থ্রারাইটিসের মতো রোগগুলির মূল কারণ হচ্ছে আমাদের ইমিউন ব্যবস্থা আমাদেরই ক্ষতি করে। এসব ক্ষেত্রে নিজ ইমিউনিটিকে নিজেকেই নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। মেথোট্রেক্সেট ঠিক সে কাজটাই করে শ্বেত রক্তকণিকার বিভাজন কন্ট্রোল এর মাধ্যমে।

ব্যবহার:
১. ক্যান্সার কেমোথেরাপি
২. অটোইমিউন রোগ (ত্বকের সোরিয়াসিস, রিউমাটয়েড আর্থ্রারাইটিস, ক্রনস ডিজিজ)

*এসব রোগে আমাদের ইমিউন ব্যবস্থা (রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা) আমাদের দেহের কোষ/টিস্যুকে বাইরের কোষ/টিস্যু ভেবে আক্রমণ এবং ক্ষতিসাধন করে।
৩. মেডিক্যাল এবোরশন

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া:
মেথোট্রেক্সেট খুবই শক্তিশালী কোষ ধ্বংসকারী। তাই এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও বেশি।
১. ফুসফুস এবং কিডনির জটিলতা
২. বমি, জ্বর, দুর্বলতা ও ইনফেকশন
৩. শ্বেত রক্তকণিকা কমে যাওয়া
৪. পাকস্থলীর আলসার
৫. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়া, প্রভৃতি।

সতর্কতা:
১. মেথোট্রেক্সেট গ্রহণকারী মায়ের সন্তানকে দুগ্ধপান করানো নিরাপদ নয়।
২. কিডনি রোগীদের জন্যে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।
৩. মেডিসিনের টেরাটোজনিক প্রভাব বিদ্যমান। টেরাটোজনিক প্রভাব মানে হচ্ছে মায়ের মেডিসিন গ্রহণে গর্ভ-অভ্যন্তরীণ সন্তানের ক্ষতি হবার আশঙ্কা, বিশেষ করে নানা অস্বাভাবিকতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করার ঘটনা।
৪. পেনিসিলিন বা অন্যান্য অ্যান্টিবায়োটিক এর সাথে মেথোট্রেক্সেট গ্রহণ করলে তা নিষ্কাশন হতে বেশি সময় লাগে। ফলশ্রুতিতে বিষাক্ততা দেখা দিতে পারে।
৫. পেইন কিলার এবং গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ এর সাথে মেথোট্রেক্সেট নিলেও নানা ভয়ঙ্কর জটিলতা দেখা দিতে পারে।

অতএব, মেথোট্রেক্সেট এর মতো প্রতিক্রিয়াশীল মেডিসিন গ্রহণ করার সময় আমাদেরকে অবশ্যই যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং শুধুমাত্র রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের পরামর্শক্রমেই তা গ্রহণ করা যাবে।

Facebook.com/byaponsm

ডাইনোসরদের নিয়ে কিছু ভ্রান্ত ধারণা

জয় দেব নাথ

বিজ্ঞানীদের মতে, একসময় প্রায় ১৬ কোটি বছর ধরে এই পৃথিবীর স্থলভাগ শাসন করতো প্রাগৈতিহাসিক ডাইনোসররা। প্রতিনিয়ত গবেষণা এবং ফসিল আবিষ্কারের মাধ্যমে আমরা তাদের সম্পর্কে আরও অনেক নতুন নতুন তথ্য জানতে পারছি। যদিও ইতোমধ্যে আমরা তাদের সম্পর্কে যা জেনেছি তাও নেহাতই কম নয়, তবুও এখনো অনেকের মধ্যেই এই প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীগুলো সম্পর্কে অনেক ভ্রান্ত ধারণা রয়ে গিয়েছে। তেমনই কয়েকটি ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটাতে আজকের এই লেখাটি।

বিজ্ঞানীদের মতে, একসময় প্রায় ১৬ কোটি বছর ধরে এই পৃথিবীর স্থলভাগ শাসন করতো প্রাগৈতিহাসিক ডাইনোসররা। প্রতিনিয়ত গবেষণা এবং ফসিল আবিষ্কারের মাধ্যমে আমরা তাদের সম্পর্কে আরও অনেক নতুন নতুন তথ্য জানতে পারছি। যদিও ইতোমধ্যে আমরা তাদের সম্পর্কে যা জেনেছি তাও নেহাতই কম নয়, তবুও এখনো অনেকের মধ্যেই এই প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীগুলো সম্পর্কে অনেক ভ্রান্ত ধারণা রয়ে গিয়েছে। তেমনই কয়েকটি ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটাতে আজকের এই লেখাটি।

১. সব ডাইনোসরই বিলুপ্ত

আজ থেকে প্রায় সাড়ে ৬ কোটি বছর আগের কথা, তখন পৃথিবীতে ডাইনোসরদের রাজত্ব চলছে। ডাইনোসররা এবং অন্যান্য প্রাণীরা একে অন্যের সাথে সুখেই সংসার করছে। হঠাৎ একদিন ১০ কিলোমিটার ব্যাসের চেয়ে বড় একটি উল্কাপিণ্ড আঘাত হানে পৃথিবীতে, যার কিছু কিছু অংশ টুকরো টুকরো হয়ে স্পেসে পর্যন্ত চলে যায়। শুরু হয় ধ্বংসযজ্ঞ। বিশাল এক বিস্ফোরণ, যার আশপাশের কয়েক'শ কিলোমিটারের ভেতর যা ছিল সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। যেই ছাই উড়ালেও কোনো অমূল্য রতন পাওয়া যাবেনা।

ধাক্কাটা এতই জোরালো ছিল যে মাটির নিচের টেকটোনিক প্লেটকে পর্যন্ত নাড়িয়ে দিয়েছিল। শুরু হয় ভূমিকম্প আর সুনামি। সমুদ্রের আশপাশের সব এলাকা পানির নিচে তলিয়ে যায়, সাথে প্রাণীরাও। আর বাকি যেসব জায়গা পানির বাইরে ছিল তার প্রায় বেশিরভাগ জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল বিস্ফোরণ থেকে সৃষ্টি রেডিয়েশন। যা স্থলে থাকা বাকি প্রাণের ধীরে ধীরে বিনাশ শুরু করে। আর যারা এই রেডিয়েশন থেকে বাঁচতে পেরেছে তারা পড়েছিল খাদ্য সংকটে! যা পৃথিবী জুড়ে মহামারী আকার নেয়। কথায় বলে না, সময় খারাপ গেলে সব বিপদ একসাথে আসে!

একটা মাত্র উল্কাপিণ্ড পৃথিবীর ৭৫ শতাংশ জীববৈচিত্র্য যেন নিমেষেই শেষ করে দেয়। স্বাভাবিক বেশিরভাগ ডাইনোসররাও এই ধ্বংসযজ্ঞ থেকে বাঁচতে পারেনি।

- কি? বেশিরভাগ? সব না?
- না, সব না। বিশাল আকৃতির গুলোই বিলুপ্ত হয়েছিল বেশিরভাগ।
- তো এর থেকে বেঁচে যাওয়া বাকি ছোট ডাইনোসরগুলো কই? তারপর ওদের কি হলো?
- আছে তো, এখনো পৃথিবীতেই আছে। ঐ ধ্বংসযজ্ঞের পর পৃথিবীর পরিবেশ, খাদ্যশৃঙ্খল অনেকটাই পাল্টে গিয়েছিল। তাই বিজ্ঞানীদের ধারণা পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে তারা অভিযোজিত হয়েছে আজকের বিভিন্ন প্রজাতির পাখিদের মধ্যে, যেমন টি-রেক্স ডাইনোসরের সবচেয়ে কাছের আত্মীয় আজকের মুরগি।
- কিহ! মুরগি?
- হ্যাঁ টি-রেক্সের জিনের সাথে মুরগির বেশ ভালোই জিন কম্বিনেশন আছে। হ্যাপি চিকেন ডিনার!

২. ডাইনোসররাই এপর্যন্ত পৃথিবীতে জন্মানো সবচেয়ে বড় প্রাণী

সবচেয়ে বড় ডাইনোসরের নাম জানো কি?
- আর্জেন্টিনোসরাস?
- হ্যাঁ। আর্জেন্টিনোসরাস (Argentinosaurus), যাদের দৈর্ঘ্য ১৩০ ফুট এবং ওজন ১১০ টন পর্যন্ত হতে পারে। আর বর্তমান পৃথিবীর স্থলভাগের সবচেয়ে বড় প্রাণী আফ্রিকান হাতিরা,

যাদের ওজন হয় ৬ টনের মতো। কল্পনা করতে পারছো এর বিশালতা? না পারলেও সমস্যা নেই, নিচে ছবি আছে। যাইহোক, আমাদের জানা মতে এরাই আজ পর্যন্ত পৃথিবীর মাটিতে জন্মানো সবচেয়ে বড় ডাইনোসর।
- তাহলে তো এরাই নিঃসন্দেহে পৃথিবীতে জন্মানো সবচেয়ে বড় প্রাণীও বটে! তাই না?
- না, এরা পৃথিবীর স্থলভাগের সবচেয়ে বড় প্রাণী হতে পারে, তবে পৃথিবীর সমুদ্রের গভীরে রয়েছে এরচেয়েও বড় দানব এবং সেটি আজও শাসন করছে সমুদ্রকে!
- আজও?
- হ্যাঁ, এটি আজও ঘুরে বেড়াচ্ছে সমুদ্রের বুকে। ব্লু হোয়েল বা নীল তিমি। এরা লম্বায় আর্জেন্টিনোসরাস এর মতো হলেও ওজনের দিক থেকে এদের চেয়ে অনেকাংশে বেশি। এদের ওজন হতে পারে ১৯০ টন পর্যন্ত!

চিত্র-১: আর্জেন্টিনোসরাস (Argentinosaurus)

তবে কিছু দিন আগে বিজ্ঞানীরা পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার সমুদ্রে সম্ভবত এর চেয়েও বড় কিছু খুঁজে পেয়েছেন, Siphonophore Apolemia নামের এই প্রাণীটি (organism) দেখতে অনেকটাই জেলিফিশের মতো। তবে আকারে এর ব্যাস ২০০০ ফুট, আর দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫০ ফুট। হতে পারে এটিই এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে জন্মানো সবচেয়ে বৃহদাকার প্রাণী।

তবে এটা নিয়ে এখন বিতর্ক আছে, হতে পারে এটা একাধিক জীবদেহের (organism) সম্মিলিত রূপ। দেখা যাক! শীঘ্রই হয়তো সত্যিটা আমাদের সামনে আসবে। তবুও বলতে হয় ওজনের দিক থেকে এটা হয়তো নীল তিমির ধারে কাছেও হবে না। তাই সবদিক থেকে দেখতে গেলে নীল তিমিই হলো এখনো পর্যন্ত আমাদের জানা মতে সবচেয়ে বৃহৎ প্রাণী।

চিত্র-২: Siphonophore Apolemia organism

৩. সব ডাইনোসররাই বৃহদাকার

আমাদের প্রায় সবারই ডাইনোসরদের কথা ভাবলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে ইয়া বড় বড় দানবীয় ডাইনোসরদের ছবি। সত্যি বলতে কিছু কিছু ডাইনোসর তো আমাদের কল্পনার চেয়েও অনেক বড়। তবে তার মানে এটা নয় যে, সব ডাইনোসররাই এমন বৃহদাকৃতির ছিল। প্রকৃতপক্ষে বেশির ভাগ ডাইনোসর তো আমাদের মানুষের আকার অথবা একটা কুকুরের

চিত্র-৩: কম্পসোগনাথেস (Compsognathus) ও ওকিউলোডেন্টাভিস (Oculudentavis)

আকারেরই ছিল। যেমন একটা টার্কি মুরগির আকারের কম্পসোগনাথেস (Compsognathus) ডাইনোসর। আর এই পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট ডাইনোসরটির নাম ওকিউলোডেন্টাভিস (Oculudentavis) পাখি, যার সবচেয়ে ছোট ফসিলের আকার ছিল মাত্র

১.৪ সেন্টিমিটার। এর থেকে আন্দাজ করা যায় যে এর সাইজ বর্তমানে পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট পাখি বি হামিংবার্ড (Bee hummingbird) এর মতোই ছিল।

৪. ডাইনোসররা কেবল গভীর জঙ্গলে বসবাস করতো

ডাইনোসরদের কথা চিন্তা করলে আরেকটা জিনিস যেটা চোখের সামনে ভেসে আসে সেটা হল গভীর অরণ্য। চারদিকে বিশাল বিশাল গাছ আর ঘন ঝোপঝাড়! যদিও বেশির ভাগ ডাইনোসররা এমন পরিবেশই পছন্দ করতো, কারণ এর ফলে খাদ্য এবং নিরাপত্তা দুটোই ভালো ভাবে পাওয়া যেত। তবে এর মানে এটাও না যে ডাইনোসররা প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকতে পারতোনা। কারণ সাহারা মরুভূমি থেকে শুরু করে এন্টার্কটিকা পর্যন্ত সব জায়গায় ডাইনোসরদের রাজত্ব বিস্তৃত ছিল। তেমনই একটা ডাইনোসর ছিল ক্রাইয়োলোফোস্যারাস (Cryolophosaurus), যারা জুরাসিক যুগে এন্টার্কটিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিকারি প্রাণী ছিল।

চিত্র-৪: ক্রাইয়োলোফোস্যারাস (Cryolophosaurus)

৫. মানুষ ডাইনোসরদের হাত থেকে পালিয়ে বাঁচতে পারবেনা

জুরাসিক পার্কের মতো অন্যান্য মুভি দেখে তোমাদের মধ্যে হয়তো ধারণা হয়েই গিয়েছে যে, মানুষ আর ডাইনোসররা যদি একসাথে থাকতো তবে কি অবস্থাটাই না হতো! এটা সত্যিই যে অন্যান্য ছোটখাটো ডাইনোসররা আমাদের তেমন সমস্যার কারণ না হলেও শিকারি ডাইনোসররা আমাদের জন্য খুবই ভয়ঙ্কর হতে পারতো। এটা বলতে কোনো সন্দেহ নেই যে মুখোমুখি একা লড়াইয়ে আমরা তাদের সাথে কখনোই পেরে উঠতে পারতামনা। কিন্তু পালাতে তো পারতাম!

- কি! ডাইনোসরদের থেকে পালিয়ে বাঁচতে পারতাম?
- না, সব ডাইনোসরদের থেকে না। তবে যেসব আমাদের জন্য ভয়ঙ্কর সেগুলো থেকে হয়তো পালিয়ে বাঁচতে পারতাম। কারণ একটি শিকারি টিরেক্স ডাইনোসর সাধারণত ঘণ্টায় ২০

কিলোমিটারের আশপাশে গতিতে দৌড়াতো, আর মানুষের দ্রুততম গতির রেকর্ডটি হল প্রায় ৪৫ কিলোমিটার ঘণ্টায়।

তাই কোনো সময় এমন ভয়ঙ্কর ডাইনোসরের তাড়া খেলে, কি করতে হবে নিশ্চয়ই জেনে গিয়েছো? হ্যাঁ সিম্পল, একটা ভোঁ দৌড় দিতে হবে!

তথ্যসূত্রসমূহ:

- *https://www.nhm.ac.uk/discover/how-an-asteroid-caused-extinction-of-dinosaurs.html.*
- *https://www.quantamagazine.org/how-birds-evolved-from-dinosaurs-20150602/*
- *https://www.smithsonianmag.com/science-nature/t-rex-linked-to-chickens-ostriches-180940877/*
- *https://www.panamajack.com/blog/the-largest-animals-to-ever-exist-blue-whales/*
- *https://theswaddle.com/scientists-have-found-the-longest-marine-organism-on-australias-western-edge/*
- *https://en.m.wikipedia.org/wiki/Dinosaur_size*
- *https://en.m.wikipedia.org/wiki/Compsognathus*
- *https://en.m.wikipedia.org/wiki/Oculudentavis*
- *https://www.sciencedaily.com/releases/2020/03/200318143733.htm*
- *https://en.m.wikipedia.org/wiki/Cryolophosaurus*

দুঃখ প্রকাশ

ব্যাপন মে-জুন ২০২১ সংখ্যায় "একজন বাঙালী বিজ্ঞানী" রচনাটিতে দ্যা স্ট্যাটিমেন্ট এর সূত্রে সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও আইনস্টাইনের একটি ভুল ছবি প্রকাশিত হয়েছিল। আমরা এই অনাকাঙ্ক্ষিত ভুলের জন্য আন্তরিক ভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি।

চিনে রাখি অসুখগুলো

ডাঃ মোঃ ফজলুল কবির পাভেল

কিডনিতে পাথর, কারণ ও প্রতিকার

নানা কারণে কিডনি, মূত্রনালি বা মূত্রথলিতে পাথর হতে পারে। কি কি কারণে পাথর হয় তার সবকিছু এখন পর্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে জানা সম্ভব হয়নি। তবে বেশ কিছু কারণ জানা গিয়েছে। এসব থেকে দূরে থাকতে পারলে কিডনিতে পাথর হবার সম্ভাবনা অনেক কমে যাবে।

কিডনিতে যাতে পাথর না হয় সেজন্য পানি পর্যাপ্ত পরিমাণে খেতে হবে। তবে যাদের কিডনিতে সমস্যা হয়ে গিয়েছে তারা চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে পানি খেতে হবে। কারণ তাদের ক্ষেত্রে পানি বেশি খেলে সমস্যা হতে পারে। হিসেব করে পানি খেলে কিডনি ভালো থাকবে।

আবার দেহে ক্যালশিয়ামের পরিমাণ বেড়ে গেলে কিডনিতে পাথর হবার আশঙ্কাও বেড়ে যায়। সুতরাং ক্যালশিয়াম মাত্রাতিরিক্ত খাওয়া যাবেনা। দুধ বা দুগ্ধজাত খাবারে ক্যালশিয়াম থাকে অনেক। এসব খাবার খুব বেশি পরিমাণ গ্রহণেও রেনাল স্টোনের সম্ভাবনা বাড়ে।

লম্বা সময়ের জন্য প্রস্রাব আটকে রাখলে মূত্রথলিতে ইনফেকশন দেখা দিতে পারে। মূত্রথলিতে ইনফেকশন বারবার হলে কিডনিতে পাথরের আশঙ্কা বাড়ে। যদি বারবার এ ধরনের সমস্যা হয় তা হলে কারণ বের করার চেষ্টা করতে হবে এবং দ্রুত চিকিৎসা করতে হবে। অনেকসময় দীর্ঘদিন অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া লাগতে পারে। বাংলাদেশে বাইরের পরিবেশে টয়লেট এর সুব্যবস্থা না থাকায় মেয়েদের ক্ষেত্রে এই সমস্যা বেশি দেখা দেয়।

প্রোটিন ও ফ্যাট জাতীয় খাবার বেশি খেলে কিডনিতে পাথর হতে পারে। মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে প্রোটিন ও ফ্যাট জাতীয় খাবারের প্রবণতা বাড়ছে। এতে বাড়ছে কিডনিতে পাথর হবার আশঙ্কা।

খুব গরমের মধ্যে দীর্ঘদিন কাজ করলে কিডনিতে পাথর হতে পারে। তাই এরকম পরিবেশে কাজ করলে প্রচুর পরিমাণে পানি খেতে হবে। প্রয়োজনে গরম থেকে বাঁচতে ছাতা বা ক্যাপ ব্যবহার করতে হবে।

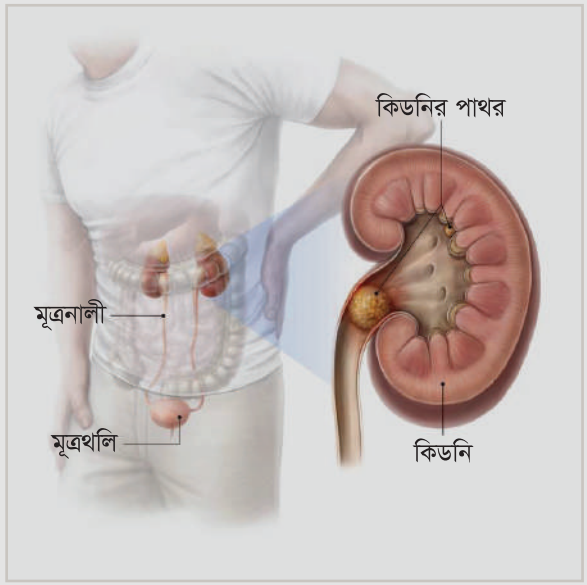

অক্সালেট জাতীয় খাবার কিডনিতে পাথর তৈরি করতে পারে। শিম, মটরশুঁটি, বিভিন্ন শাকে, চকোলেট এবং কফিতে প্রচুর অক্সালেট থাকে। তাই মূত্রথলি বা প্রস্রাবে সমস্যা দেখা দিলে বা কিডনিতে সমস্যা থাকলে এসব খাবার বেশি পরিমাণে গ্রহণ করা যাবে না।

এ সব সাধারণ কিছু নিয়ম মেনে চললে রেনাল স্টোন বা কিডনিতে পাথরের ভয় অনেকটা কমে। কিন্তু এই অসুখ শরীরে বাসা বাঁধলেও অনেকেই প্রথম অবস্থায় বুঝে উঠতে পারেন না। অনেক সময় কিডনি অনেকদূর ক্ষতি হয়ে গেলে তারপর ধরা পড়ে। তাই সাবধান হয়ে চলতে হবে। তলপেট বা শরীরের নিচের অংশে প্রচণ্ড ব্যথা, প্রস্রাবের সাথে রক্ত যাওয়া প্রভৃতি মূত্রথলি ও কিডনিতে পাথরের অন্যতম প্রধান লক্ষণ। এ ধরনের কোনো সমস্যা দেখা দিলে দ্রুত ডাক্তার দেখাতে হবে। তবে আশার কথা কিডনির পাথরের অনেক আধুনিক ভালো চিকিৎসা আছে। কিডনিতে পাথর হলে ইউরোলজিস্ট এর পরামর্শ নেয়া আবশ্যক। ■

তোমাদের প্রশ্ন আমাদের উত্তর

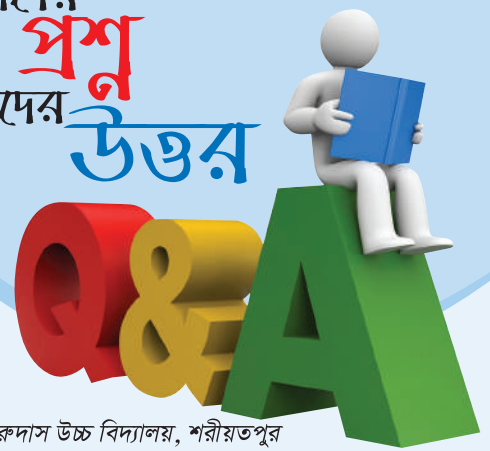

প্রশ্ন: বাতাস কেন প্রবাহিত হয়?

এস.এম.আপন, ১০ম শ্রেণি, পালং তুলাসার গুরুদাস উচ্চ বিদ্যালয়, শরীয়তপুর

উত্তর: বাতাস মূলত পৃথিবীর পৃষ্ঠকে ঘিরে রাখা বিভিন্ন গ্যাসের সামষ্টিক রূপ। অভিকর্ষের আকর্ষণ কাটিয়ে ছুটে যেতে না পারা গ্যাসগুলো নিয়েই বাতাস। এখন বদ্ধ পুকুরে পানি যেমন স্থির থাকে তেমন ভাবে নির্দিষ্ট স্থানে বাতাস কেন স্থির না থেকে পৃথিবীর এক দিক থেকে অন্যদিকে ছুটে যায়? জেনে হয়তো অবাক হবে, বাতাস প্রবাহিত হওয়ার মূল কারণ হলো পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের তাপমাত্রার তারতম্য।

যে গ্যাসগুলো নিয়ে আমাদের বায়ুমণ্ডল গঠিত, তাপমাত্রার পরিবর্তনে তারা খুব সক্রিয় ভাবে সাড়া দেয়। যখন কোনো স্থানের তাপমাত্রা বেড়ে যায় তখন সে স্থানের গ্যাসসমূহে গ্যাসীয় অণুসমূহের গতি বেড়ে যায়। ফলে তাদের একটি অণু থেকে আরেক অণুর দূরত্ব বেড়ে যায়, আকর্ষণ কমে যায়, এবং বড় জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে উপরের দিকে উঠে যেতে থাকে। এ কারণেই ফুটন্ত পানির পাত্র থেকে বের হওয়া জলীয় বাষ্প সর্বদা উপরের দিকে উঠতে থাকে। আর বাতাস যখন ঠাণ্ডা হয় তখন অণুসমূহের গতি কমে যায়, তাদের আন্তঃআণবিক আকর্ষণও বেড়ে গিয়ে অণুসমূহ পরস্পরের কাছাকাছি এসে ঘনত্বে বেড়ে গিয়ে নিচের দিকে নেমে আসে।

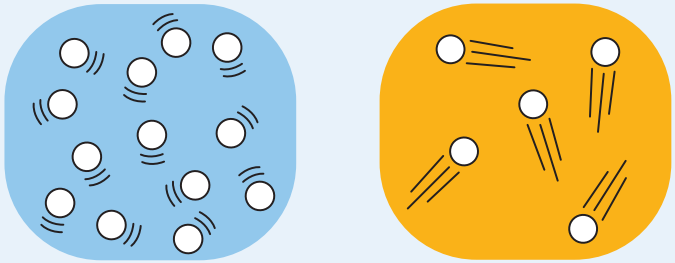

ঠাণ্ডা বায়ুতে গ্যাসীয় কণা *চিত্র-১* *উষ্ণ বায়ুতে গ্যাসীয় কণা*

সূর্যের আলোয় বাতাস উষ্ণ হয়ে উঠে। কিন্তু গোলাকার পৃথিবীর সব জায়গায়তো সূর্যের আলো ও তাপমাত্রা সমান ভাবে পৌঁছায় না। কোনো স্থানের কৌণিক অবস্থান, সমুদ্র বা পাহাড়ের উপস্থিতি প্রভৃতি কারণে কোনো জায়গায় সূর্যের তাপমাত্রা বেশি আসে আবার কোনো জায়গায়

কম। ফলে উষ্ণতর অঞ্চল সমূহে বাতাস গরম বাতাসের আয়তন বেড়ে গিয়ে বাতাসের ঘনত্ব কমে যায় এবং উষ্ণ বাতাস উপরের দিকে উঠে যাওয়ার মাধ্যমে সে স্থানে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। আবার কোনো কোনো স্থানে তাপমাত্রা কম থাকায় সেখানে বাতাসের অণু সমূহ কাছাকাছি থেকে সে স্থানের বাতাসের ঘনত্ব বাড়িয়ে সেখানে উচ্চচাপ তৈরি হয়।

চিত্র-২: নিম্নচাপের সৃষ্টি

আর এখন এখানে কাজ করে ব্যাপনের নীতি। পৃথিবীর সকল প্রবাহীর সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো তা উচ্চচাপের অঞ্চল থেকে নিম্নচাপের অঞ্চলে ব্যাপিত হয়, যতক্ষণনা একটা সমতা তৈরি হচ্ছে। তো বাতাসের ক্ষেত্রেও তাই ঘটে। বাতাস তখন নিম্নচাপ অঞ্চল থেকে উচ্চচাপ অঞ্চলের দিকে ছুটে আসে।

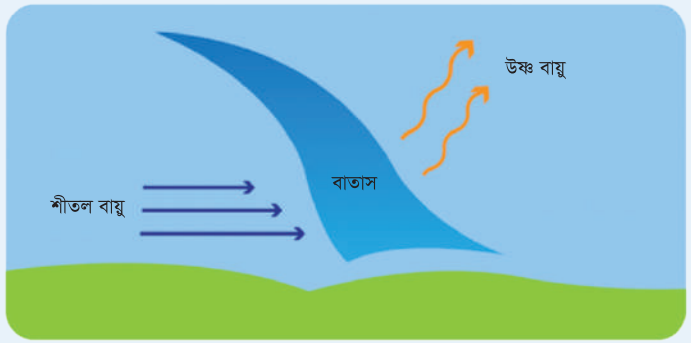

চিত্র-৩: বাতাসের প্রবাহ

যেহেতু পৃথিবীর সর্বত্র তাপমাত্রা কখনোই একরকম হয় না, তাপমাত্রা হ্রাস বৃদ্ধির চক্রে বাতাসের অবিরাম ছুটে চলা জারি থাকে। আবার এভাবে হুট করে সমুদ্রের উপরিভাগের তাপমাত্রা অনেক বেড়ে গিয়ে সেখানকার বাতাসের চাপ অনেক নিচে নেমে গেলে স্থলভাগের উচ্চচাপের অঞ্চল থেকে তীব্রবেগে হাওয়া সেদিকে প্রবাহিত হয়। সৃষ্টি হয় শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়, সূত্রপাত ঘটে বিধ্বংসী সাইক্লোনের। তো নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো, বাতাস কেন প্রবাহিত হয়?

অ আ ক খ ঙ

ব্যাপন ১ম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

বাংলা বিজ্ঞান লেখা প্রতিযোগিতা ২০২১

বিজয়ীদের অনুভূতি

"ব্যাপন প্রথম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বাংলা বিজ্ঞান লেখা প্রতিযোগিতায় ১ম স্থান অধিকার করায় প্রথমেই আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করি। আলহামদুলিল্লাহ। সেইসাথে সকল বিজয়ীদেরও জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। ব্যাপনকে অনেক ধন্যবাদ এরকম চমৎকার একটি আয়োজন উপহার দেয়ার জন্য। মাতৃভাষা বাংলায় বিজ্ঞান চর্চায় ব্যাপনের এই পথচলা হোক অবিরাম ও অবিচল।"

মোহাম্মদ সিয়াম
শিক্ষার্থী, আল-আমিন বাড়ীয়া কামিল মডেল মাদরাসা
ফলাফল: প্রথম স্থান অধিকারী
পুরস্কার: ১০,০০০ টাকা, ক্রেস্ট ও সনদ

"আলহামদুলিল্লাহ। শুকরিয়া আদায় করছি মহান রবের। যিনি আমাকে সারাদেশের শত শত প্রতিযোগীর মধ্য থেকে বিজয়ী হবার তৌফিক দিয়েছেন। আমি যারপরনাই খুশি। খুশি ব্যাপনের কাজেও। বিজ্ঞানকে পাঠকের কাছে ভিন্ন আঙ্গিকে, ভিন্ন ভঙ্গিতে বিজ্ঞানের সৌরভ ছড়িয়ে দেবার যে মহা-প্রয়াস ব্যাপন চালিয়ে যাচ্ছে, তা এক কথায় অনবদ্য। বাস্তবতা যতই কঠিন হোক, ব্যাপনের কাছে আমার আবেদন, ব্যাপনকে দ্বিমাসিক থেকে মাসিক করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক। দেশব্যাপী স্কুল-কলেজগুলোতে ব্যাপনের বিজ্ঞান সংক্রান্ত এক্টিভিটি আশা করছি। 'সকলের মাঝেই ব্যাপিত হোক ব্যাপনের সৌরভ, এই প্রত্যাশা রেখে পুরো ব্যাপন পরিবারের জন্য আন্তরিক দু'আ ও ভালোবাসা জ্ঞাপন করে ক্ষুদ্র মন্তব্যের ইতি টানছি। সালামুন আলাইকুম।"

এম এ রায়হান
শিক্ষার্থী, বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়
ফলাফল: দ্বিতীয় স্থান অধিকারী
পুরস্কার: ৮,০০০ টাকা, ক্রেস্ট ও সনদ

"ব্যাপন পরিবারকে বিজ্ঞানভিত্তিক এতো সুন্দর একটি প্রতিযোগিতা আয়োজন করার জন্য ধন্যবাদ। এই প্রতিযোগিতায় আর্টিকেল লিখার সময় আমি অনেক কিছু শিখতে পেরেছি আর সবসময় নতুন কিছু শিখতে পারছি তাদের মাসিক ম্যাগাজিন থেকে। এজন্য ব্যাপন পরিবারকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।"

অমিত হাসান নুরনবী
শিক্ষার্থী, সেইন্ট জর্জ হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ
ফলাফল: তৃতীয় স্থান অধিকারী
পুরস্কার: ৫,০০০ টাকা, ক্রেস্ট ও সনদ

"ব্যাপন প্রথম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বাংলা বিজ্ঞান লেখা প্রতিযোগিতা'য় বিজয়ী হতে পেরে খুব ভালো লাগছে। এত সুন্দর একটি প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই ব্যাপন পরিবারকে। ব্যাপনের সর্বাঙ্গীণ সফলতা কামনা করি। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার সৌরভকে ব্যপিত করার প্রয়াসে ব্যাপন অর্জন করুক ঈর্ষণীয় সফলতা"।

মোঃ আব্দুল্লাহ আবু সাঈদ
শিক্ষার্থী, রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ
ফলাফল: চতুর্থ স্থান অধিকারী
পুরস্কার: ৪,০০০ টাকা, ক্রেস্ট ও সনদ

"মাতৃভাষাকে যারা করেছে আলিঙ্গন,
তারাই আজ আলোকিত করছে বিশ্বাঙ্গন।
ব্যাপনের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২১ উপলক্ষে আয়োজিত "ব্যাপন প্রথম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা বাংলা বিজ্ঞান লেখা প্রতিযোগিতার" দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের প্রথম সাফল্যের আরম্ভ করতে পেরে সত্যিই আনন্দিত ও অভিভূত।

আলহামদুলিল্লাহ্ মাতৃভাষা দিয়েই প্রথম লেখার পথচলা শুরু। এই প্রতিযোগিতার সাথে জড়িত সবাইকে এবং যারা আমাকে অংশগ্রহণে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আগামীতে লেখার পরিধি যেন আরও বিস্তৃত করতে পারি সেজন্য সবার কাছে দোআ প্রার্থী। আলহামদুলিল্লাহ্ সবকিছুর জন্য।
আসসালামু আলাইকুম।"

মাহজাবিন প্রেমা পায়েল
শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ফলাফল: পঞ্চম স্থান অধিকারী
পুরস্কার: ৩,০০০ টাকা, ক্রেস্ট ও সনদ

"একটি অভিনব আয়োজন! বাংলা ভাষায় সহজ ও সাবলীলভাবে 'জিন এডিটিং' বিষয়ে লেখার চেষ্টা করেছি। ব্যাপনকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত সুন্দর একটি আয়োজনের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞান নিয়ে লেখার ছোট ছোট চেষ্টাগুলোকে অনুপ্রাণিত করার জন্য।"

শময়িতা সাইদ
শিক্ষক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
ফলাফল: ষষ্ঠ স্থান অধিকারী
পুরস্কার: ২,০০০ টাকা, ক্রেস্ট ও সনদ

"২৮ ফেব্রুয়ারি। ব্যস্ততম দিন ছিল একটা। সারা রাত জার্নি করে এসেছি ঢাকা থেকে বগুড়া। টুকটাক হাতের কাজ করতে করতে ঘড়িতে ১২টা-১টা বেজে গেছে। গোসল নামাজ খাওয়া সেরে, বিছানায় ক্লান্ত শরীরটা এলিয়ে দিলাম। মোবাইল হাতে নিয়ে ফেসবুকের নিউজ ফিড স্ক্রল করছিলাম। স্ক্রল করতে করতে ব্যাপনের বিজ্ঞান লেখার সার্কুলেশনটা দেখতে পাই।

লেখালেখির আগ্রহ ছিল ছোটবেলা থেকেই। ডায়েরিতে কবিতা, ছোট গল্প, সনেট অনেক কিছুই লেখা আছে। সময় পেলেই লেখি। কলেজের ম্যাগাজিনে এক বন্ধুর অনুরোধে একটা সনেট দিয়েছিলাম ছাপানোর জন্য। পরে সেটা পাবলিশ হলে ছাপানো অক্ষরে নিজের লেখাগুলো দেখে অনেক ভালো লেগেছিল সেদিন। ব্যাপনের সাথে পরিচয় তার যাত্রাকালের শুরুর থেকেই। নিয়মিত ব্যাপন পড়তাম। আগে থেকে ইচ্ছে থাকলেও কখনও লেখা পাঠাইনি। মনে করলাম লেখালেখির প্রতিযোগিতার এই সুযোগে একটা লেখা দিয়েই ফেলি।

ধরেই নিয়েছিলাম আমার লেখা মনোনীত হবে না। তারপরেও ব্যাপনের প্যাজ, ওয়েবসাইট নিয়মিত ভিজিট করতাম। ২৪ মে সন্ধ্যায় ফেসবুক লগিন করতেই নিউজ ফিডের একদম উপরেই দেখি ব্যাপনের বিজ্ঞান লেখা প্রতিযোগিতার ফলাফল। শেষের থেকে পড়া শুরু করলাম বিজয়ীদের নাম। ৭ম এ এসেই চোখ আটকে গেলো। আমার নাম! বানান দেখে শিওর হলাম এইটা মুফরাদ, মুরাদ না। কনফার্ম হওয়ার সাথে সাথেই নিজের আইডিতে শেয়ার দিলাম। কাছের বন্ধুদের টেক্সট করলাম।

আসলে এই রকম লেখালেখির প্রতিযোগিতায় প্লেস করা এইটাই প্রথম তাও আবার ব্যাপনের মতো একটা জনপ্রিয় পত্রিকায়। অনেকে যখন শেয়ার করা পোস্টে অভিনন্দন জানাচ্ছিল, মনে হলো যে.. না...আসলেই এটা একটা অ্যাচিভমেন্ট!

লেখালেখির পুরনো অভ্যাসটা হয়তো আবার শুরু করবো। ব্যাপনের কাছে নিয়মিত এরকম লেখালেখির প্রতিযোগিতা চাই। ব্যাপনের মাধ্যমে আরও নতুন নতুন লেখকেরা উঠে আসুক, বিজ্ঞানের সৌরভ সবার মাঝে ব্যাপিত হোক। সেই সাথে ব্যাপনের ব্যাপক প্রচার-প্রসার কামনা করি।"

মোঃ মুফরাদ আলী
শিক্ষার্থী, এএমআইই (আইইবি)
ফলাফল: সপ্তম স্থান অধিকারী
পুরস্কার: ২০০০ টাকা, ক্রেস্ট ও সনদ

"এরকম একটা অর্জন আল্লাহ তায়ালা আমার রিযিকে রাখায় সবার প্রথমে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জানাই। শুকরিয়া জানাই ব্যাপনের প্রতিটি সদস্যকে যারা কঠোর পরিশ্রম করে এই প্রতিযোগিতাটিকে সুসম্পন্ন করেছেন। এই প্রতিযোগিতা আমাকে লেখালেখি চালিয়ে যেতে অনেক উজ্জীবিত করেছে। আশা করি এরকম আরো অনেক লেখককে প্রতিভা বিকাশের সুযোগ করে দিতে ব্যাপন আরো ভূমিকা রাখবে। সত্যের পথে ব্যাপন আরো এগিয়ে যাক এই আমার কামনা।"

আবরার জাওয়াদ
শিক্ষার্থী, ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ
ফলাফল: অষ্টম স্থান অধিকারী
পুরস্কার: ২০০০ টাকা, ক্রেস্ট ও সনদ

"আমাদের দেশ হোক কিংবা মস্তিষ্ক, উন্নতি করতে হলে বিজ্ঞান চর্চার কোনো বিকল্প নেই। আর বাংলা ভাষায়, এই বিজ্ঞান প্রসারের এমন এক উদ্যোগ নেয়ার জন্য ব্যাপন এর প্রতি ধন্যবাদ এবং শুভকামনা রইল।"

জয় দেব নাথ
শিক্ষার্থী, এম. শাহ আলম চৌধুরী ডিগ্রি কলেজ
ফলাফল: নবম স্থান অধিকারী
পুরস্কার: ২০০০ টাকা, ক্রেস্ট ও সনদ

"ব্যাপনের পাতায় নিজের নাম দেখব, এটি আমার টু-ডু লিস্টে আছে যেদিন ব্যাপনের প্রথম সংখ্যা হাতে পাই, সেদিন থেকে। টু-ডু লিস্টে টিক মার্ক দিতে কার না ভাল লাগে!"

মায়িশা ফারজানা
শিক্ষার্থী, রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (রুয়েট)
ফলাফল: দশম স্থান অধিকারী
পুরস্কার: ২০০০ টাকা, ক্রেস্ট ও সনদ

Facebook.com/byaponsm

EASTERN UNIVERSITY
Distinction in Education

Eastern University

A Leader in Quality Education

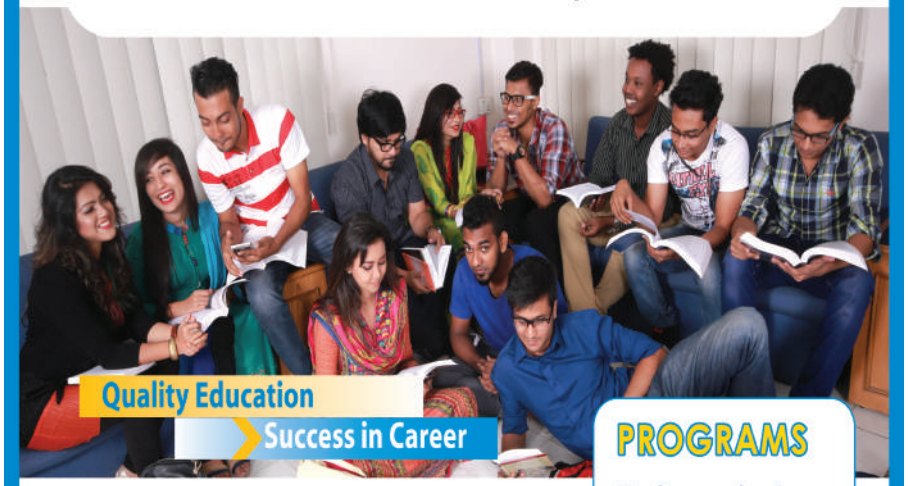

Features

- 22 Ph.Ds and Professors (full-time)
- International Collaborations with 20 Universities
- 24 International Scholarships for EU students
- 18 different clubs and forums

PROGRAMS

Undergraduate
- B.A. (Hons.) in English
- BBA
- B.Sc. in CSE
- B.Sc. in CSE (Evening)
- B.Sc. in EEE
- LL.B. (Hons.)

Graduate
- M.A. in ELL (Evening)
- M.A. in ELT (Evening)
- MBA (Evening)
- EMBA (Evening)
- LL.M. (1 year)

Direct Admission

Combined GPA 7 and above

EEE ACCREDITED BY IEB

FOR ADMISSION

House 26, Road 5, Dhanmondi, Dhaka 1205
Phone: 9671912, 9671925
E-mail: admission@easternuni.edu.bd

Admission Helpline
01741300002

www.easternuni.edu.bd

/eu.edu.bd

Asian University of Bangaldesh

Estd. 1996

Govt. & UGC Approved | ISO Certified | www.aub.edu.bd | aub.edu.bd

Admission Open Spring 2018

Our Honors & Masters Programs

BBA & MBA (Exe/Reg/Eve)	BA (Hons) & MA in Islamic History & Civilization
BSc (Engg.) in CSE	BSS (Hons) & MSS in Sociology & Anthropology.
(Special waiver for Diploma Engrs.)	BSS (Hons) & MSS in Social Work
BSc (Hons) in CS	BSS (Hons) & MSS in Economics
BA (Hons) & MA in English	BSS (Hons) & MSS in Govt. & Politics
BA (Hons) & MA in Bengali	MSS in Information Sc. & Library Management
BA (Hons) & MA in Islamic Studies	B Ed & M Ed

আগামিয়া স্থায়ী ক্যাম্পাসে ভর্তির ক্ষেত্রে BBA, MBA, CSE CS & English–৫০% এবং অন্যান্য বিষয়ে ২৫% ছাড়!!

Permanent Campus
Tongabari, Ashulia, Savar, Dhaka.
01678664402

21 years of Success

Waiver

- Admission fee 100% free.
- Special tuition fee waiver for couples & siblings.
- Full free studentship for Golden GPA 5 (SSC & HSC) and 05% to 75% tuition fee waiver for meritorious students.
- Full free studentship for the children of freedom fighters.

Admission Office

House 3, Road 7, Sector 7, Uttara, Dhaka. Ph: 48950729, 58956116 (Ext. 101, 102) 01678664413, 01678664419, 01678664402

DOWNLOAD OUR MOBILE APPLICATION

Looking to Hire?

BD CAREER HOME

POST FREE JOB

No Credit Card Requirea

www.bdcareerhome.com

Looking for a Job?
Donno!t Worry
Visite Now!!!
www.bdcareerhome.com
www.facebook.com/bdcareerhome